KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : 9/- 9/- 9/- 9/- 9/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ আষাঢ়, ১৩৬৬ শ্রাবণ, ১৩৬৬ ভাদ্র, ১৩৬৬ আশ্বিন, ১৩৬৬
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 June '59 (0.50) SAMAKALI

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা-১২

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

সপ্তম বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৬৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য…

দুরধিগম্য তাদেরই একসূত্রে গ্রথিত ক'রে এক বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের সৃষ্টি করেছে আমাদের রেলপথ—ভৌগলিক সান্নিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ করেছে। ভৌগলিক অখণ্ডতাকেও অতিক্রম ক'রে যে আত্মিক ঐক্যে আজ সারা ভারতবর্ষ প্রাণময়—তা' আন্তঃআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংযোগের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।

চারু ও কারুশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার কী অন্তহীন বৈচিত্র্যই না রয়েছে আমাদের স্বদেশে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও

পূর্ব রেলওয়ে

ERJPA/G

সমকালীন

আষাঢ় ॥ সপ্তম বর্ষ ॥ ১৩৬৬

॥ সূচীপত্র ॥

মানবজীবনে প্রেমের ভূমিকা ॥ বারট্রান্ড রাসেল ১৬১

সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রশ্ন ॥ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৬৬

অ্যাডাম স্মিথ ॥ মঞ্জুলা বসু ১৬৯

উপন্যাস ও নাটক ॥ নিতাই বসু ১৭৫

এক ছিল কন্যা ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪

সাংবাদিকতার বিপদ ॥ অমল ঘোষ ১৯২

ছেলে চাই ॥ সোমেন বসু ১৯৭

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে প্রগতিশীল নাটক ॥ অমিতাভ মৈত্র ১৯৯

সমালোচনা—ভবতোষ দত্ত, হীরেন বসু ২০২

॥ সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

উ ল্লে খ যো গ্য ব ই ও প ত্র প ত্রি কা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(সংক্ষিপ্তসার) দাম : এক টাকা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(সংক্ষিপ্তবিবরণী) দাম : ছয় আনা

॥ ছো ট দে র জ ন্য ॥

দেশ-বিদেশের উপকথা

মনোজিৎ বসু

দাম : এক টাকা

যারা দেখাল নতুন আলো

হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

গুঞ্জন

দীপ্তি সেনগুপ্তা

ছুটির দিনের কবিতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেল-নুন-কড়ি

শ্যামাপ্রসাদ আচার্য

চলার পথে—বাদলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

জয় যাত্রা—নীলিমা সেন

ভারত আমার

সতীকুমার নাগ

দামোদর

বিশ্ব বিশ্বাস

প্রতিটি বই সচিত্র এবং দাম চার আনা

হাতের কাজ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

প্রতি খণ্ড পঞ্চাশ নয়া-পয়সা

আমাদের পতাকা

দাম—পঞ্চাশ নয়া-পয়সা

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্য-বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩, টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

উইক্লি ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ইংরেজি সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৬, টাকা; ষান্মাসিক ৩, টাকা।

বসুন্ধরা

গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি-বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২, টাকা।

শ্রমিক-বার্তা

শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা-হিন্দি পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ১·৫০ টাকা;

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। বার্ষিক ৩, টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

মগ্‌রেবী বংগাল

উর্দু ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩, টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

অনুসন্ধান করুন

(বইয়ের জন্য) পাব্‌লিকেশন্ সেল্‌স-অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা ১

(পত্র-পত্রিকার জন্য) **প্রচার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,** রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা ১

স ম কা লী ন

স প্ত ম ব র্ষ

আ ষা ঢ় । ১ ৩ ৬ ৬

মানবজীবনে প্রেমের ভূমিকা

বারট্র্যাণ্ড রাসেল

প্রেমের প্রতি অধিকাংশ মানবগোষ্ঠির প্রচলিত মনোভাব আশ্চর্যভাবে দ্বিকোটিক। একপক্ষে কাব্য, নাটক কি উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেম,—অন্যপক্ষে তা' আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ দায়িত্বশীল সমাজতাত্ত্বিক দ্বারা অসমর্থিত, এবং এমনকি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিকল্পনায় ঈপ্সীতেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। এই মনোভঙ্গি, আমার বিশ্বাস, ন্যায়সংগত নয়। মানবজীবনের সর্ব-গুরুত্তম বস্তু বলে আমি প্রেমকে মান্য করি। এবং এও বিশ্বাস করি যে তার নির্বাধ-গঠন-বিরোধী যে কোন প্রক্রিয়াই অপকৃষ্ট।

ব্যবহারের যাথার্থ্যে প্রেম প্রতিটি যৌনসম্পর্ক নয়, কেবলমাত্র যেটি যুগপৎ মানসিক ও দৈহিক এবং যথেষ্ট পরিমাণ আবেগান্বিত তাকেই ইংগিত করে। তা' তীব্রতার যে কোন পরিমাণ আয়ত্ত করতে পারে। Tristan and Isolde— এ অভিব্যক্ত এ জাতীয় আবেগ সংখ্যাতীত নরনারীর অভিজ্ঞতার সমান্তরাল। প্রেমের আবেগকে কলাসম্মত রূপদান সুদুর্লভ কিন্তু সেই আবেগই অন্ততঃ য়ুরোপে অস্তিত্ববান নয়। আমাদের ছাড়া অন্যান্য সমাজে তা' সুলভতর। আমার বিশ্বাস কোন বিশেষ জনগোষ্ঠির জাতীয় চারিত্রিকতার উপর নয়, বরং তার প্রতিষ্ঠান-সমূহ ও প্রচলিত নিয়মধারার উপরেই প্রেম নির্ভরশীল। চীনে প্রেম দুষ্প্রাপ্য। একমাত্র দুষ্টা বারনারীর মোহে মতিভ্রান্ত অসৎ সম্রাটেরই চারিত্রবৈশিষ্ট্য হিসাবে তার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি। চৈনিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যে কোন প্রকার তীব্র আবেগের পরিপন্থী। যে কোন অবস্থায় মানুষের পক্ষে যুক্তির সাম্রাজ্য সংরক্ষণ করাই তার কাম্য। এ ব্যাপারে অস্মদীয় অষ্টাদশ শতাব্দের প্রাথমিক অবস্থার সঙ্গে তার সাম্য আছে। আমরা যারা পশ্চাতের রোমান্টিক আন্দোলন, ফরাসীবিপ্লব এবং মহাযুদ্ধের ঘটনাবলীতে অভিজ্ঞ তারা এ সত্য সম্বন্ধে সচেতন যে রাণী এ্যানের রাজত্বকালে মানবজীবনে যুক্তির যে ভূমিকা প্রতিশ্রুত হয়েছিল বর্তমানে তা তেমন প্রভুত্বশীল নয়। এবং মনোবিশ্লেষণের প্রকল্প সৃষ্টিতে যুক্তি ইদানীং নিজেই বিশ্বাসহন্তারক। আধুনিক জীবনে প্রধান তিনটি অতি যৌক্তিক কর্মপ্রক্রিয়া হচ্ছে ধর্ম, যুদ্ধ ও প্রেম। এরা সক-

লেই অতিযৌক্তিক বটে কিন্তু প্রেম যুক্তিবিরোধী নয়। এর অর্থ এই যে যুক্তিপরায়ণ মানুষ এর অস্তিত্বে যুক্তিসংগত ভাবেই সানন্দ হতে পারে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত কারণমালার জন্যই সাম্প্রতিক পৃথিবীতে প্রেম ও ধর্মের মধ্যে একটি নিশ্চিত পরস্পর বিরোধের অস্তিত্ব আছে। মনে হয়না সে বিরোধ অনতিক্রম্য। কৃচ্ছ্রসাধনায় নিহিতমূল অন্যকয়েকটির অসদৃশ এই খৃষ্টীয়ধর্মই তার জন্য দায়ী।

বর্তমান বিশ্বে অবশ্য ধর্মের চেয়েও বলবত্তর একটি শত্রু প্রেমের আছে আর তা হচ্ছে কর্মযোগ এবং অর্থনৈতিক মোক্ষলাভের সুসমাচার। লোকায়ত বিশ্বাস, বিশেষতঃ মার্কিণ মহাদেশে এই যে— কোন মানুষের পক্ষে প্রেমের প্রেরণায় বৃত্তি বিচলিত হওয়া অবিধেয়। যদি হয় তবে সে মহৎ মূর্খামি! মানবপ্রসঙ্গিত যে কোন ঘটনার মতই এ ঘটনায়ও কিন্তু ভারসাম্যেরই আবশ্যিকতা। যদিচ কখনো কখনো অতি সকরুণ নায়কোচিত তথাপি প্রেমের জন্য সম্পূর্ণতঃ বৃত্তিবিসর্জন যেমন মূর্খতা,— মাত্র বৃত্তি-প্রসক্তিতে প্রেম পরিবর্জনেও সমপরিমাণ নির্বুদ্ধিতাই। অর্থের সার্বজনীন লুন্ঠনবৃত্তির উপরে ব্যবস্থিত সমাজে এতৎসত্ত্বেও অনিবার্য্যভাবেই এ ঘটনা ঘটে। সাম্প্রতিক কালীন বিশেষতঃ আমেরিকার চারিত্রিকভাবে ব্যবসায়ীর যে কোন একজনের জীবন সম্বন্ধে কল্পনা করুন। যৌবনপ্রারম্ভ হতেই তার সর্বোত্তম চিন্তা এবং সকল শক্তিপ্রেরণা অর্থনৈতিক সাফল্যদেবতার পায়ে নিবেদিত হয়েছে। সে প্রসঙ্গ ছাড়া সব কিছুই মাত্র অগুরুত্বের আনন্দ-আমোদ। যৌবনে বারনারী সঙ্গে মাঝে মধ্যে তার দৈহিক দাবীর তৃপ্তি হয়েছে। বর্তমানে যদিও যে বিবাহিত তথাপি তার স্ত্রীর ও তার কাম্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এবং বস্ততঃপক্ষে সে কখনও তার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেনা। কর্মস্থল থেকে নৈমিত্তিক প্রত্যাবর্তন তার বিলম্বিত আর শ্রমক্লান্তও। তার প্রাতঃকালীন শয্যাত্যাগ মুহূর্তও নিদ্রাচ্ছন্ন স্ত্রীর অনবধানেই। তার রবিবাসরীয় নৈবেদ্য মাত্র গল্‌ফের জন্য ঃ কেননা অর্থ-সংগ্রামে তার শারীরিক পটুত্বের প্রয়োজন আছে। তার স্ত্রীর কামনা-বাসনাগুলিকে তার নিতান্তই স্ত্রীজনসুলভ মনে হয়। আর তাই সেগুলিকে যদ্যপি সে অনুমোদনও করে,— তাতে অংশ গ্রহণের প্রয়াস সে কদাপি করেনা। বিবাহ-ঘটিত প্রেম ব্যতিরিক্ত অন্য কোন অবিধিসংগত প্রেমে সময়হরণ করার সময় তার সুলভ নয়, যদিও কার্য্যব্যাপদেশে বাড়ী থেকে দূরে থাকলে বারনারী-সঙ্গ সে ক্রয় করে থাকে। তার প্রতি তার স্ত্রীর থাকে একপ্রকার যৌন-ঔদাস্য। এ ঘটনা আশ্চর্য্যের নয় কেননা তার স্ত্রীকে প্রেম-প্রসাধিতা করার সময় সে পায়না। অবচেতনায় সে অতৃপ্ত থাকে— অথচ কারণ তার অগম্য। তার অতৃপ্তি সে কর্মে মজ্জমান করে। কখনো বা অন্যতর অবাঞ্ছিত উপায়ে যথা— পুরস্কারকামী যুদ্ধদর্শনের কিংবা র‍্যাডিক্যালদের আহত করার অন্যায় নিষ্ঠুর আনন্দ-সংগ্রহে সে আপন অতৃপ্তি প্রচ্ছন্ন করে। সমপরিমাণ অতৃপ্ত তার স্ত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষ্টিতে এবং উদার ও মুক্তলোকগুলিকে বিব্রতকারী নৈতিক শুদ্ধির সংগ্রামে আত্মবঞ্চনার সদুপায় আবিষ্কার করে। দম্পতীর যৌন-অপরিতৃপ্তি পরিণামে মানববিদ্বেষে পর্য্যবসিত হয়। অবশ্য তা জনস্বার্থানুপ্রেরণা বা অত্যুচ্চ নৈতিক মান ইত্যাদির ছদ্মবেশে সংগোপন থাকে। যৌন-প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আমাদের ভ্রান্ত ধারণার জন্যই এ জাতীয় দুর্ভাগ্যকর পরিস্থিতি উদ্ভুত হয়। সন্ত পলের আপাতচিন্তা ছিল এই যে বিবাহের একমেব উদ্দিষ্ট যৌনসংগমের সুযোগ। আর এই মতাদর্শ খৃষ্টীয় নীতিবাগীশদের প্রচারে প্রায় সর্বতোভাবেই উৎসাহিত হয়েছে। যৌন বিষয়ে তাদের অনীহা যৌনজীবনের অন্যতর সূক্ষ্মপ্রদেশগুলি সম্বন্ধেও তাদের অনবহিত রেখেছে। আর তাতে করে শৈশবে যারা তাদের শিক্ষার পীড়া সহ্য করেছে তারা তাদের অন্তরংগ শক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন হয়েই

জীবন যাপন করে। মাত্র যৌনসঙ্গমেচ্ছা থেকে বহু উচ্চতার, স্বাতন্ত্রের বস্তু প্রেম। বৃহত্তর জীবনবৃত্তাংশে অধিকাংশ নরনারী যে নিঃসংগতায় যন্ত্রণাবিদ্ধ হয় সে শূন্যবলয় হতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় প্রেম। উদাসীন পৃথিবী সম্বন্ধে কিংবা বিশৃঙ্খল জনতার সম্ভাব্য নির্মমতা সম্বন্ধেও প্রতি মানুষের হৃদয়েই একটি প্রোথিতমূল ভয় আছে। তাছাড়া আছে স্নেহবুভুক্ষা। প্রায়শই পুরুষের মধ্যে তা' রূঢ়তা, অভব্যতা, দুর্বিনয়ে এবং নারীর মধ্যে বিরক্তিকর সোদ্বিগ্নতা ও গালিকার্কশ্যে গোপন থাকে। পারস্পরিক আবেগোদ্দীপ্ত প্রেম দীর্ঘায়ু হলে এ অনুভূতির বিলোপ ঘটে। দ্বৈতের অদ্বৈত পরিণতিতে নূতনতর সত্তা নির্মাণ করে প্রেম অহং-এর প্রস্তরকঠিন প্রাচীর ভূমিসাৎ করে। প্রকৃতি মানুষকে নিঃসংগ জীবনযাপনের জন্য নির্মাণ করেনি। প্রাকৃতিক জৈব উদ্দেশ্য সাধনে সে কারণে সে অন্যতর সত্তার সাহায্য দাবী করে। সভ্যমানুষ তার যৌনানুভূতির পরিপূর্ণ তৃপ্তি প্রেম ছাড়া করতে পারেনা। দেহমনময় তার সমগ্র সত্তা কোনপ্রকার সম্পর্ক প্রবিষ্ট না হলে এ অনুভূতির সম্পূর্ণ তৃপ্তি ঘটেনা। যারা পারস্পরিক পরিতৃপ্ত প্রেমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা এবং ভাববিকীর্ণ অন্তরংগতার আস্বাদ জানেননি তারা জীবনের সর্বোত্তম দান হতে প্রবঞ্চিত হয়েছেন। সচেতন বা অচেতনভাবে হোক তারা এ সত্য অনুভব করেনই। এবং ফলতঃ নৈরাশ্য তাদের ক্রমাগত ঈর্ষা, অত্যাচার, ও নিষ্ঠুরতার অভিমুখীন করে। যেহেতু এ অভিজ্ঞতার অনস্তিত্বে নরনারীমাত্রেই পরিপূর্ণ বিকাশোদ্ভিন্ন হননা, এবং তদ্ব্যাতিরিক্ত অবশিষ্ট পৃথিবীর প্রতি সন্দীপ্ত সহৃদয়তা বিকীর্ণ করার অসামর্থ্যে তার সামাজিক কর্মও নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়,— সে কারণেই সমাজতাত্ত্বিকদের পক্ষেও আবেগসম্পৃক্ত প্রেমের যথোচিত মর্যাদা দেওয়াই কর্তব্য।

উপযুক্ত পরিস্থিতিতে জীবনের কোন না কোন বৃত্তাংশে প্রতিটি নরনারীই আবেগসন্দীপ্ত প্রেম উপলব্ধি করেন। অনভিজ্ঞদের পক্ষে অবশ্য মাত্র আকর্ষণ ও প্রেমের স্বাতন্ত্র্য হৃদয়ংগম করা সুকঠিন। ভালো না বেসে কোন পুরুষকে মাত্র চুম্বনদানেও অনিচ্ছা উদ্দীপিত করার শিক্ষাধীনা প্রাচুর্য্যলালিত ধনিকদুহিতাদের পক্ষেই বিশেষ করে এই সত্য প্রয়োগোপযোগী। আবিবাহ কৌমার্য্যের অক্ষুন্নতা দাবী করলে ক্ষণায়ু গুরুত্বহীন যৌনাকর্ষের বলি হওয়া কুমারীদের পক্ষে অনিবার্য্যই। যৌনাভিজ্ঞা কোন নারীর পক্ষে কিন্তু এ ব্যাপার ও প্রেমের পার্থক্য সহজেই উপলব্ধ হয়। অনেক বিবাহ-দুর্বিপাকের এই হচ্ছে কারণ। পারস্পরিক প্রেমের অস্তিত্বেও কোন না কোন পক্ষের প্রেমের প্রতি পাপমন্যতার প্রত্যয়েও তা' বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। এ প্রত্যয় দৃঢ়ভিত্তিক হওয়াও সম্ভব। উদাহরণতঃ পার্ণেল। তার ব্যাভিচারের দুষ্কৃতি পান্নাদ্বীপের আশা আকাংখা বহুদিন বিলম্বিত করেছিল বলেই পাপকর্ম। কিন্তু যত্র পাপমন্যতা ভিত্তিহীন প্রেম সেখানেও সমপরিমাণ বিষাক্ত হয়ে ওঠে। যে বিত্ত প্রেম দান করতে সমর্থ, তার কাছ থেকে যদি তা' সম্পূর্ণ প্রাপ্তির সদিচ্ছা থাকে তবে তাকে পরিপূর্ণ স্বাধীন অবাধ উদার ও সম্পূর্ণ আন্তরিক করতে হবে।

এমনকি বিবাহ-ঘটিত প্রেমের মধ্যেও প্রথাগত শিক্ষার ফলে যে পাপমন্যতার চেতনা সঞ্চারিত হয়,—তা' প্রায়শই মুক্ত মতাদর্শের বা প্রাচীন মতপন্থীর প্রতিটি নরনারীর অবচেতনায় সক্রিয় হয়। এর প্রতিক্রিয়া নানাবিধ ঃ প্রায়শই পুরুষকে রতিকলা ব্যাপারে তা' নিষ্ঠুর, বর্বর ও সহানুভূতিহীন করে তোলে কেননা সে প্রসঙ্গে নারীমনস্তত্ব জিজ্ঞাসার বাককৌশলে সে

অপারঙ্গম এবং নারীর পক্ষে অত্যাবশ্যক চরমানন্দের জন্য সঙ্গমের পূর্বপ্রস্তুতির সোপান-পরম্পরার তাৎপর্যকেও সে মূল্য দেয়না। বস্তুতঃপক্ষে তারা কদাচিৎ উপলব্ধি করে যে নারীর পক্ষেও আনন্দের অভিজ্ঞতা অতিপ্রয়োজনের, আর নারীর এ অতৃপ্তি তার প্রেমিকেরই ত্রুটি। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নারীর ঔদাসীন্যে কথঞ্চিৎ অহংবিলাস আছে। শারীরিক রক্ষণশীল সংকোচ তার অপরিমিত। এবং দৈহিক অন্তরঙ্গতার প্রতিকূল অনিচ্ছাও থাকে প্রভূত। এক-জন কৌশলী নায়ক হয়তো চারিত্রিক এবম্বিধ উদাসীনতা বিজিত করতে সমর্থ কিন্তু যিনি উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে মর্যাদাদানে অভ্যস্ত তার পক্ষে তা' অসম্ভব। ফলতঃ বিবাহোত্তর বহু ষড়-ঋতুপর্যায় বিগত হলেও দম্পতীর যুগল সম্পর্ক নির্বাধ হয়না এবং প্রথানুগতিকই থাকে।

আধুনিক বিশ্বে প্রেমের পরিপূর্ণ উদ্ভিন্নতার বাধাস্বরূপ আরও একটি মানসিকতার অস্তিত্ব আছে। তা' হচ্ছে বহুমানুষের চেতনায় তাদের ব্যক্তিত্বক্ষুণ্ণতার অতিসুলভ ভীতি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সাধক, সাধ্য নয়। জাগতিক সম্পর্কে ফলবান হওয়াই তার কর্তব্য এবং এই সাধনায় স্বাতন্ত্র্যলুপ্তিই তার ঔচিত্য। স্ফটিকাধারে সংরক্ষিত ব্যক্তিত্বের নিষ্প্রাণ হওয়াই নিয়তি ঃ আর যা' মানবিক সম্পর্কমালায় সম্প্রসারিত তাই হয় জীবনসম্পদে ঋদ্ধিবান। ব্যক্তি ও পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্কসৃজনের উল্লেখযোগ্য উৎস হচ্ছে প্রেম, শিশু ও কর্ম। এদের মধ্যে সময়ানুক্রমিকভাবেই প্রেম হচ্ছে প্রথমতম। তদুপরি অপত্যস্নেহের সম্যক স্ফুরণের পক্ষে এর প্রয়োজন অতি আবশ্যিক। কেননা শিশু পিতা-মাতা উভয়েরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির পুন-নির্মাণ করে। যদি পিতামাতা পরস্পরের প্রতি প্রেমার্ত না হয় তবে শিশুর মুকুরে মাত্র আত্ম-বৈশিষ্ট্যই প্রত্যক্ষ করবে এবং অন্যের চারিত্রিকতা আবিষ্কার করে ব্যথিতও হবে। কর্মপ্রেরণা-তেই সর্বদা মানুষ বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ অর্জন করেনা। সে অর্জন বিশেষ কর্মের আন্তরিক উদ্দীপকের উপরেই নির্ভরশীল। মাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্ম কদাপি সে মূল্য প্রাপ্ত হয়না। কোন বস্তু হোক, স্বপ্ন হোক, অথবা কোন ব্যক্তিই হোক,—এদের প্রতি যে কর্মে তীব্র ভক্তির উদ্দীপনা থাকে তাতেই তা' সম্ভব। মাত্র স্বাধিকার প্রমত্ততার প্রেম মূল্যহীন। তখন সে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যানিহিত কর্মের সঙ্গে সমান্তরাল। যে মূল্য-প্রাপ্তি প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা তা' অর্জনের জন্য,— নিজের অহংএর মতই যে অন্যের অহং-ও অতিগুরুত্বের,—প্রেমের পক্ষে এই উপলব্ধিই প্রয়োজন। অপরের কামনা-বাসনা নিজের নিজস্ব বলে উপলব্ধি করাও প্রয়োজনের। তার অর্থ এই যে অহমিকার মাত্র সচেতন সম্প্রসারণ নয় অন্যের অহংবোধকে ঘনিষ্ঠতায় আত্মস্থ করার একটি সহজাত প্রেরণার অস্তিত্বও থাকবে। অংশত প্রোটেষ্ট্যাণ্টবাদ ও অংশত রোমাণ্টিক আন্দোলনের দান আমাদের বুদ্ধিহীন ব্যক্তিপূজার সংস্কার এবং অস্মদীয় দ্বন্দ্বপ্রিয় প্রতিযোগীপন্থী সমাজব্যবস্থার জন্যই এ সাধনা কঠিনতর হয়েছে।

অত্র যে গুরুত্বে আমরা প্রেমের আলোচনা করছি সেই প্রেম সাম্প্রতিক স্বাধীন মানুষ-দের কাছে অন্যবিধ একটি বিপন্ভীত হয়ে আছে। অতি সামান্য উদ্দীপনাজাত যৌনসঙ্গমে প্রতিবারই লোকে যখন কোন নৈতিক বাধাই উপলব্ধি করেনা গভীর আবেগ এবং প্রীতির উপলব্ধি থেকে তখন তারা যৌনচেতনাকে অসম্পৃক্ত করতেই অভ্যস্ত হয়। এবং এমনকি ঘৃণার অনুভূতিও তাদের অনুষঙ্গ হয়ে পড়ে। Aldous Huxley-র উপন্যাসে এর উদাহরণ সহজলভ্য।

সন্ত পলের মতই তাঁর পাত্রপাত্রীগুলি যৌনসঙ্গমকে একটি শারীর-মুক্তি বলেই মনে করে। এর চেয়ে উচ্চতর মূল্যবোধের সঙ্গে তাকে সম্পৃক্ত করা তাদের অজ্ঞাত মনে হয়। কৃচ্ছ্র-সাধনার পুনর্জন্ম এ জাতীয় মনোভঙ্গির মাত্র আর এক সোপান উপরে। প্রেমের নিজস্ব যথার্থ আদর্শ আছে,— আত্মস্থ স্বকীয় নৈতিক মানও বিদ্যমান। খৃষ্টীয় শিক্ষাধারা এবং তরুণতরদের সোৎসাহ সকলপ্রকার যৌননৈতিকতার বিরুদ্ধে অনিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহেই তা' প্রচ্ছন্ন হয়েছে। প্রেম-ব্যতিরিক্ত যৌনমিলন সহজাতবৃত্তিতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি আনয়ন করতে অক্ষম। এমত আমার নয় যে কদাপি তা' ঘটা অবিধেয় ঃ কেননা তার নৈশ্চিত্যের জন্য আমাদের এমন সব দৃঢ় প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজন হবে যে তাতে করে প্রেমও বিঘ্নিত অনিরাপদ হবে। আমার বক্তব্য মাত্র এই যে প্রেমবিচ্ছিন্ন দেহমিলন প্রায় মূল্যহীন, এবং মাত্র প্রথমতঃ প্রেমের সার্থকতার জন্যই তা' সম-র্থন করা চলে।

মানবজীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, আমরা দেখেছি, যে প্রেমের বৃহৎ দাবী আছে। কিন্তু প্রেম একটি সম্পূর্ণ নৈরাজ্যবাদী শক্তি। অশৃঙ্খলিত প্রেম কোন বিধিতে প্রথায় আবদ্ধ হয়ে থাকবার নয়। শিশুসম্পৃক্ত হবার পূর্বে এ ব্যাপার গুরুত্বের নয়। কিন্তু জাতকের জন্মলগ্ন থেকেই আমরা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেশবাসী। সেখানে প্রেম আর স্বয়ং-শাসিত নয় বরংচ জাতির জৈবিক দায়িত্বপালনের সে ভূমিকা গ্রহণ করে। শিশুপ্রসঙ্গিত এমন এক সামাজিক নীতিরচনার প্রয়োজন আছে যা' কিনা দ্বন্দ্বমুহূর্তে ভাবোদ্দীপ্ত প্রেমের দাবীকে বশীভূত করে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রেম নিজেও শুভঙ্কর বলে এবং পিতামাতার পারস্পরিক প্রেম শিশুদের পক্ষেও অশুভ নয় বলে যথার্থ সজ্ঞান নীতি অবশ্য এ দ্বন্দ্বকে যথাসম্ভব পরিমিত করারই প্রয়াস পাবে। শিশুপালননিহিত অনিবার্য্য বাধার পরিমাণ প্রেমজীবনে স্বল্পতম করাই সেই বিবেচক যৌননীতির প্রধানতম লক্ষ্য হবে। অবশ্য এ প্রসঙ্গ পরিবারের আলোচনা ব্যতীত আলোচিত হওয়া সম্ভব নয়।

অনুবাদ। **রবীন্দ্র বিশ্বাস**

সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রশ্ন

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

শিল্পরসিক রাজার সামনে একটি নগ্ন নারী চিত্র রাখা হইল। চিত্রটির দিকে তাকাইয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন, 'অশ্লীল'। চিত্রকর বলিলেন, 'মহারাজ। উহা অশ্লীল নয়।' রাজা বলিলেন, 'অশ্লীল নয়, তবে কি?' 'দেখাইতেছি'—এই বলিয়া চিত্রকর চিত্রটি লইয়া বাহিরে গেলেন এবং তুলি দ্বারা নগ্ন নারীমূর্তির পায়ে দুইটি মোজা পরাইয়া দিলেন। তারপর চিত্রটি যখন রাজার সামনে আনা হইল রাজা এক লহমার জন্য চিত্রটির পানে তাকাইয়া তৎক্ষণাৎ হাত দিয়া চোখ ঢাকিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'হটাও হটাও, এ অতি জঘন্য।'

নগ্ন নারী দেহের মধ্যে যে একটি অনাবৃত সুষমা ছিল, সমগ্র তনুলতাখানি ঘিরিয়া যে একটি সারল্যের আবরণ ছিল, পরবর্তী চিত্রে তা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়াছে। পায়ে দুইটি মোজা পরাইয়া দেওয়ার ফলে দেহের নগ্নতা এত প্রকট হইল, নারী-দেহের যে একটি স্বতন্ত্র লাবণ্য আছে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার স্থূল নগ্নতার দিকে দর্শককে এমনভাবে আকৃষ্ট করা হইল যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য দর্শকের মনে আদি রিপুকে জাগ্রত করিয়া দেওয়া। ফলে দর্শকের মনে গভীর লজ্জার উদ্রেক হইল এবং তাহার সঙ্গে মিশিয়া থাকিল একটি জঘন্য ভাব। পাঠকমনে যে সাহিত্য এই ভাব জাগ্রত করিয়া দেয় তাহাই অশ্লীল। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতেও 'নির্জনে একাকী বসিয়া পাঠ করিলেও যে সাহিত্য পাঠকের মনে লজ্জা ও ঘৃণার ভাব জাগ্রত করে তাহাই অশ্লীল।'

প্রশ্ন উঠিতে পারে লজ্জা ও ঘৃণার ভাব উদ্রিক্ত হইলেও তাহার সঙ্গে যে মনে একটি আনন্দের ভাব আসে তাহা তো অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই আনন্দ কাহারও কাম্য হইতে পারে না। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি করা, যাহা আমাদের মনকে আনন্দ রসে আপ্লুত করিয়া দেয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সাহিত্যে সৃষ্ট রসের সঙ্গে সত্য, সৌন্দর্য ও মঙ্গলময়তার সম্পর্কটি অপরিহার্য। অর্থাৎ সাহিত্যের আনন্দ মনে যদি উন্নতভাবের সৃষ্টি না করে, মনকে যদি এক অলৌকিক মায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে না পারে তবে তাহাকে সৎ-সাহিত্য বলা যাইতে পারে না। মনে আনন্দ যে কোন উপায়ে সৃষ্টি করা যাইতে পারে। অজানাকে জানিবার আগ্রহ মানুষের অপরিসীম। এই আগ্রহ দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সে দুর্গম-পথে অভিযাত্রী রূপে বাহির হইয়া পড়ে। এই অভিযানের আনন্দ অপরিসীম। রাত্রির গভীর অন্ধকারে দস্যুতাও এক শ্রেণীর অভিযান। তাহাতেও একশ্রেণীর ব্যক্তিরা আনন্দলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাকে কি অভিযানের আনন্দ বলা যাইতে পারে?

মানুষের মধ্যে পশুত্ব রহিয়াছে। ষড়রিপুকে যিনি সুসংহত রাখিতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ মানব আর উহাদের তাড়নায় যিনি আত্মসমর্পণ করেন তাহাকেই আমরা পশু বলি। বিপুর তাড়নাকে সংযত রাখিতে পারে বলিয়াই মানুষ বিশুদ্ধ 'animal' নয়, 'rational animal' যে পারে না সে বিশুদ্ধ 'জন্তু'। সাহিত্য মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া থাকে, তাহাকে উন্নত, মহৎ করিয়া তুলে। কিন্তু যে সাহিত্য শুধুমাত্র তাহার 'animal instinct' গুলিকে (পশুসুলভ বৃত্তি) জাগ্রত করিয়া তাহার মনে পশুসুলভ উত্তেজনা আনিয়া দেয় এবং ইহাকেই আনন্দ বলিয়া প্রচার করিতে চায় তাহাই হইতেছে যথার্থ অশ্লীল সাহিত্য।

সাহিত্যে অশ্লীলতা বলিতে আমরা যে সাহিত্যকে বুঝিয়া থাকি তাহা গল্প-উপন্যাস, নাটক ও কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ডাক্তারী, যৌনবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থে নরনারীর যৌন-কর্ম সবিস্তারে সচিত্র বর্ণিত হয়। উহাদিগকে আমরা অশ্লীল বলি না। অভিধানে প্রচুর অশ্লীল শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকে, কেহই সেগুলিকে বাদ দিয়া দিতে বলে না। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে অর্থাৎ মানুষকে আনন্দদান করিবার জন্য যে সাহিত্য রচিত হয় শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নটি তৎসম্পর্কেই জড়ত। আর অশ্লীল বলিতে আমরা এক কথায় আদি রসাত্মক রচনাকেই বুঝিয়া থাকি। অর্থাৎ নামেই প্রকাশ আদিরস মানব মনের প্রথম রস। সাহিত্যে এই রস শ্রেষ্ঠ রসের পর্যায়ে পড়ে। তাবৎ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে এই রসেরই ছড়াছড়ি।

কিন্তু শুধু আদিরসাত্মক ব্যাপারই কি অশ্লীল? যাহা আমাদের রুচিবোধকে গভীর-ভাবে পীড়া দেয় তাহা অশ্লীল নয়? কোন বাঙ্গালী মেয়েকে যদি দেখি যে প্যান্টলুন ও হাওয়াই সার্ট পরিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে রাস্তা দিয়া চলিয়াছে তখন কি আমাদের রুচি-বোধে তীব্র আঘাত লাগেনা? ইহাও তো অশ্লীল।

এই অশ্লীলতার প্রশ্নটির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশটির কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের সমাজে প্রকাশ্যে চুম্বন অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কিন্তু ইউ-রোপীয় সমাজে যত্রতত্র প্রকাশ্যে চুম্বন কাহারও মনে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত করেনা বা ইহাকে কেহ নিন্দনীয় বলিয়াও মনে করেনা, তেমনই প্রত্যেক দেশের রুচি ও সংস্কারবোধ যুগে যুগে বদলায়। ভিক্টোরিয়ার যুগে ইংরাজ রমণীরা যেভাবে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া পোষাক পরিচ্ছদ পরিত সেই তুলনায় বর্তমান যুগের ইংরাজ মেয়েকে অর্ধনগ্ন বলিলেও চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজের সংস্কার ও রুচিবোধের সঙ্গে আজিকার বাঙ্গালী সমাজের আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে।

সাহিত্যে অশ্লীলতা বুঝিতে আমরা নর-নারীর যৌনকামনার বা ক্রিয়ার চটকদার বর্ণনা-কেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এই অশ্লীলতা অনেক সময় ভাষার দোষে বিশেষভাবে প্রকট হইয়া ওঠে। অসার্থক সাহিত্যিকের হাতে যাহা যৌনবিকাররূপে পাঠকের কাছে প্রতিভাত হয়, যথার্থ সাহিত্যিক তাহাকেই রসোত্তীর্ণ করিয়া তোলেন। আর অশ্লীলতা (obscenity) এবং অভব্যতা (vulgarity) যে এক জিনিষ নয়, তাঁহাও মনে রাখিতে হইবে। ভাষাপ্রয়োগের তারতম্যে খুব শ্লীল জিনিষও অভব্য হইয়া ওঠে। নীলদর্পণের তোরাপের মুখে যে কথাগুলি সহজ ও স্বাভা-বিক মনে হয়, নবীনমাধব সেগুলি উচ্চারণ করিলে অত্যন্ত অভব্য মনে হইত।

সংস্কৃত সাহিত্যে নারীদেহ বর্ণনায় বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখা যায়। যৌনমিলনের কথাও সংস্কৃত কবিরা বিনাদ্বিধায় বলিয়া গিয়াছেন। অনেক উন্নাসিক ইহাতে অশ্লীলতার গন্ধ পাইয়া-ছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে সংস্কৃত কবিরা নরনারীর কামবৃত্তিকে ক্ষুধাতৃষ্ণার মতই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেন এবং এই জন্যই নির্দ্বিধায় সাহিত্যে এই বৃত্তিকে রূপায়িত করিয়াছেন। কিন্তু উহা যাহাতে রসোত্তীর্ণ হইয়া সবিশেষ সৌন্দর্যমন্ডিত হয় সেদিকে তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এইজন্যই 'কাম' এই স্থায়ী ভাবের রস হইতেছে 'আদি রস'।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সংস্কৃত কবিরা প্রেম ও কামের কোন পার্থক্য করেন নাই। তাহাদের সময়ে স্ত্রী লোক পাঠিকাও ছিলেন না। পুরুষ পাঠককে উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা কাব্যরচনা করিয়াছেন। আর মানব মনের স্বাভাবিক বৃত্তিকে রূপদানের মধ্যে কোন প্রকার সংকোচ থাকিতে পারে একথা তাঁহারা জানিতেন না।

"What is natural can not be vicious, what everyone knows, surely

everyone may express ; and that mind which is only safe in ignorance, or which is only defended by decorum, possess but a very feeble defence, and importent sincerity". (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা Horance Hamen Wilson)

আধুনিক যুগের সাহিত্যিকরা নর-নারীর যৌন কামনার কথা যথেষ্টই চিত্রিত করিয়া থাকেন। তবে সংস্কৃত কবিদের সঙ্গে তাঁহাদের প্রকাশভংগীর দিকদিয়া সবিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। সংস্কৃত কবিরা যাহা সোজাসুজি বর্ণনা করিতেন, আজিকার সাহিত্যিকরা তাহাই ইংগিতের আবরণে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

"রসের উপলব্ধিতে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই, কেবল ব্যঞ্জনা পদ্ধতি বিভিন্ন। কবি যা প্রকাশ করতে চান; তার প্রকৃত রূপ বদলায়নি; রূপক বদলেছে। সেকালের স্থূল ও স্পষ্ট অলংকার এখন সূক্ষ্ম ও সংবৃত হয়েছে।" (রাজশেখর বসু) কিন্তু তাহাতে আবেদন বরং তীব্র হইয়া উঠে। "Euphemisms emphasize as much as they canceal; it sounds no more indelicate to say openly that a man lays with a woman than it does to say he had relations with her, besides being a more acurate phrase" (Lord Devid Cecil).

কোন কোন লেখক আছেন, যাঁহারা সজ্ঞানে তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রয়োগ করেন না। কোন একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করিবার সময় তাঁহাদের মনে ভাবাবেগ এত তীব্র হইয়া উঠে যে বর্ণনার খাতিরেই তাঁহারা তথাকথিত অশ্লীলতার প্রয়োগ করিতে বাধ্য হন। যেমন ইংরাজী সাহিত্যে ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং এবং কবি ডন। তেমনই একশ্রেণীর হাস্যরসিক সাহিত্যিক আছেন যাঁহারা রসসৃষ্টির খাতিরে 'অশ্লীলতা'র আশ্রয় নেন। তাঁহাদের সাহিত্য হইতে এই সকল উপাদান বাদ দিলে কিছুই থাকিবে না। 'টিষ্ট্রাম স্যান্ডির' লেখক স্টার্ণ এই পর্যায়ে পড়েন। ইঁহাদের রচিত সাহিত্যকে কোনক্রমেই অশ্লীল বলা চলিতে পারে না। কারণ ইহারা রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের রচয়িতা।

একদল সাহিত্যিক মনে করেন যে. জীবন রূপায়নই যখন সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য তখন ইহার কোনদিকই বাদ দেওয়া চলেনা। কাজেই তাঁহারা মনস্তত্ত্বের সূত্র ধরিয়া বিবাহের প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতা হইতে আত্মরতি পর্যন্ত সব কিছুই নির্লজ্জ সরলতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইংরাজ ঔপন্যাসিক জেমস জয়েস্, ডি এইচ লরেন্স, ঔপন্যাসিক জাঁ-পল-সাৎরার এই দলে পড়েন। ইহাতেও ক্ষতি নাই যদি তাহাতে আমরা জীবনের সম্যকরূপ লাভ করি। দেহ অপবিত্র জিনিষ নয়, বৈষ্ণব কবি প্রিয়তমকে যে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করিতে চান তাহা দেহ। কিন্তু এই দেহের সঙ্গে দেহাতীতকে উপলব্ধি করিতে পারি বলিয়াই তাহা আমাদিগকে শ্লীলতা-অশ্লীলতার সীমার উর্দ্ধে অলৌকিক রসলোকে লইয়া যায়। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক জুলে রোমাঁ তাঁহার বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস 'Body's Rapture': এ যৌনমিলনের সুদীর্ঘ চিত্র অংকন করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, দেহের উল্লাস মানবমনের শ্রেষ্ঠ উল্লাস। তান্ত্রিকরাও বলিয়া থাকেন যে, ভগবান প্রাপ্তির আনন্দের সঙ্গে যদি কোন কিছুর তুলনা দেওয়া চলে তবে তাহা একমাত্র যৌন মিলনের সঙ্গেই দেওয়া চলে। কাজেই রসোত্তীর্ণ হইয়া পাঠকমনে যদি সুষমা মণ্ডিত আনন্দের উদয় হয়, তবে কোনকিছুই অশ্লীল হইতে পারে না।

অ্যাডাম স্মিথ

মঞ্জুলা বসু

অর্থশাস্ত্রের জনক অ্যাডাম স্মিথ—এই কথাটির প্রসিদ্ধি প্রায় প্রবাদবাক্যের মত। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে 'জনক' কথাটির আশ্রয় প্রায়ই গ্রহণ করে থাকি—যেমন জাতির জনক, দেশের জনক ইত্যাদি। কথাটি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের শ্রদ্ধাজনিত অতিরঞ্জন হয়ে দাঁড়ায়। যেন জাতি বা দেশের সত্তা আগে ছিল না। কিন্তু অ্যাডাম স্মিথের ক্ষেত্রে কথাটা অতিরঞ্জন মোটেই নয়। তার মানে এই নয় যে স্মিথের আগে অর্থনৈতিক চিন্তার জন্ম হয়নি। বহু আগে থেকেই নানা অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন মনীষীরা। মার্কেন্টাইল বা ফিজিওক্র্যাটিক চিন্তাবিদ্‌দের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম, মধ্যযুগে এবং তারও আগে গ্রীক, রোমান চিন্তাবিদ্‌দের মনে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোড়ন দেখা গিয়েছে। তবুও স্মিথের আগে অর্থশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়নি একথা বলা মোটেই অযৌক্তিক নয়। কারণ এর আগে সকলেই বিচ্ছিন্ন এক একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিশ্লেষণ করা ও তার বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এর চেষ্টা অ্যাডাম স্মিথের প্রথম। উৎপাদন, মূল্যতত্ত্ব নিরূপণ, বন্টন-ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থতত্ত্ব প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রের প্রায় সব বিষয় নিয়েই তিনি চিন্তা করেছেন। তাঁর আলোচনার বাইরে খুব সামান্য বিষয়ই আছে। সে চিন্তার মধ্যে মৌলিকত্ব কতটা ছিল বা তাঁর মতবাদ নির্ভুল ছিল কিনা এসব পরের কথা। পূর্ণদৃষ্টি নিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা প্রথম দেখান অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর পরে রিকার্ডো। এঁরা দুজনে মিলে যে ধারার সৃষ্টি করলেন তারই নাম হোলো ক্ল্যাসিকাল চিন্তাধারা। স্মিথ, রিকার্ডো ম্যালথাস, কেয়ার্নস্, জেমস মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিলের মধ্যে দিয়ে এই ধারা অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে প্রায় দেড়শো বছর ধরে। এই ধারা সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন জেগেছে জন স্টুয়ার্ট মিলের মনে। তারপরে এর গলদগুলি ক্রমশঃ প্রকট হয়েছে ও প্রতিক্রিয়া হিসাবে নতুন নতুন চিন্তাধারার জন্ম হয়েছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে অর্থশাস্ত্রের জন্ম দিয়ে নতুন চিন্তার পথ খুলে দিয়েছেন অ্যাডাম স্মিথ।

স্মিথকে জানতে গেলে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে হয়। তাঁর জন্ম ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে কার্ককডি নামে স্কটল্যাণ্ডের ছোট্ট একটি শহরে। তাঁর পিতা সেখানে কাস্টমসে চাকরী করতেন। পুত্রর জন্মের তিন মাস আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পিতাপুত্রের নাম একই ছিল। অ্যাডাম স্মিথ মায়ের কাছেই মানুষ। এই তীক্ষ্মবুদ্ধিশালিনী মহিলা স্মিথের জীবনকে বরাবরই গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছেন।

অনেকেই বলেছেন স্মিথের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু ঘটেনি। কিন্তু এতবড় একজন লোকের জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তাছাড়া অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে থেকে অসাধারণত্বের উপাদান যিনি সংগ্রহ করেন তিনিই তো অসাধারণ। তাই আপাতদৃষ্টিতে চমকপ্রদ না হলেও স্মিথের জীবনের অনেক ঘটনাই মনে রাখবার মতো।

১৪ বছর বয়স পর্যন্ত স্মিথ কার্ককডির স্থানীয় স্কুলেই পড়াশুনা করেন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র বলে স্কুলে তাঁর সুনাম ছিল। মাত্র হাজার দেড়েক অধিবাসী নিয়ে ছোট্ট শহর

কার্ককডি গঠিত হলেও নানা কারণে এটি স্মিথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল। শহরটি সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং ঝঞ্ঝাবাণিজ্য, জাহাজ চলাচল কোলিয়ারী ইত্যাদি এই শহরে গড়ে উঠেছিল। ক্যাপিটালিস্ট বণিকতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্মিথের ধারণার সূচনা এখানেই। ১৪ বছর বয়সেই তিনি ক্ল্যাসিক্স্ ও গণিতশাস্ত্রে যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করলেন, এখন তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো গ্লাসগো কলেজে। ১৭৩৭ থেকে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানেই তিনি পড়াশুনা করলেন। তারপরে একটি স্কলারশিপ নিয়ে পড়াতে চললেন অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে। উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে যাজকবৃত্তি অবলম্বন করা। পেশাটির উপর স্মিথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে এই ছিল পারিবারিক ইচ্ছা।

তখনও স্টিম ইঞ্জিনের জন্ম হয়নি। অতএব গ্ল্যাসগো থেকে অক্সফোর্ড পর্যন্ত চারশো মাইল পথ স্মিথ ঘোড়ার পিঠে চেপেই চললেন। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে পার্শ্ববর্তী দৃশ্যপটের পরিবর্তন স্মিথ গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেন। স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের পল্লী-অঞ্চলের দৃশ্যগত বৈষম্য, স্কটল্যান্ডের দারিদ্র ও ইংল্যান্ডের স্বচ্ছলতা এবং চাষবাসের সাফল্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর বইয়ের শিরোনামা —An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"— বেছে নেবার পেছনে এই চিন্তার হয়তো খানিকটা অংশ আছে।

ছবছর অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করে তিনি বি. এ. ডিগ্রী পেলেন। এই দীর্ঘ অবস্থান তাঁর কাছে মোটেই সুখকর হয়নি এবং অক্সফোর্ডের প্রতি তাঁর কোনদিনই কোন আকর্ষণ জন্মায়নি। জাতিগত বিদ্বেষ তখনকার দিনেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হয়তো ছিল। জাতিতে স্কট বলে স্মিথ ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অক্সফোর্ডে যথেষ্ট সুবিবেচনা ও সমাদর পাননি। এখানে তাঁর স্বাস্থ্যও ভাল যাচ্ছিল না। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সেই যে তিনি অক্সফোর্ড ছেড়ে গেলেন আর কোন-দিন ফিরে আসেন নি। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে তাঁর মত কৃতী ছাত্রকেও কোনদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রীর মামলী সম্মানটুকু দিয়ে ভূষিত করেন নি, তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। তিনি ডক্টরেট পেয়েছিলেন গ্ল্যাসগো থেকে।

এর পরে বছর তিনেক স্মিথ এডিনবরায় কতগুলি বক্তৃতা দেন। ১৭৫০—৫১ সালে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল অর্থনীতি। এরই ফলে তিনি ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে গ্ল্যাসগোতে অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার যুগ স্মিথের জীবনে একটি মূল্যবান অধ্যায়। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর গ্ল্যাসগোর সঙ্গে সেদিনকার মৃতপ্রায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করবার মত ছিল। গ্ল্যাসগোতে অবস্থানকালেই স্মিথ পরিচিত হলেন হাচিসনের সঙ্গে। স্মিথের জীবন গঠনে যে দুটি লোকের প্রভাব সবচেয়ে বেশী তাঁরা হচ্ছেন শিক্ষক হাচি-সন ও বন্ধু দার্শনিক হিউম। হাচিসনের সম্বন্ধে স্মিথ বলেছেন— "the never-to-be-forgotten Hutcheson". গ্ল্যাসগোতে তিনি ছিলেন Moral Philosophy-র অধ্যাপক। গভীর ও মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর মনে ধর্মবিশ্বাস প্রবল ছিল অথচ ধর্মীয় রীতির প্রতি অন্ধ ভক্তি ছিল না। স্মিথের মনকে তিনি অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করে চার্চের দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। স্বাভাবিক নিয়মের উপর স্মিথের গভীর আস্থার পেছনে হয়তো ছিল হাচিসনের কাছ থেকে পাওয়া ধর্মবিশ্বাস।

পরিণত বয়সে তিনি হিউমের নিবিড় সংস্পর্শে এলেন। ১৭৪০ থেকে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হিউমের মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব অটুট ছিল। হিউম ছিলেন একাধারে দার্শনিক। ঐতিহাসিক, তর্কবিদ ও অর্থশাস্ত্রবিদ। দুজনের মধ্যে ভাবের ঘনিষ্ঠ আদান প্রদান ঘটেছিল। হাচিসনের কাছে

স্মিথ পেয়েছিলেন ধর্মবিশ্বাস আর হিউমের ছিল তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টি ও বাঁধাধরা নৈতিক অনুশাসনের উপর গভীর অবিশ্বাস। যুক্তিবিচার ও অর্থনৈতিক চিন্তার দিকে স্মিথের মনকে তিনি টেনে আনলেন। এই বন্ধুত্ব সম্বন্ধে রিচার্ড হ্যালডেন বলেছেন, "But for Hume, Smith would never have been." এটা খানিকটা অতিরঞ্জন বলে মনে হয় কারণ হিউ-মের কাছে স্মিথের ঋণ গভীর হলেও তাঁর মতবাদ ও তাঁর লেখাগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সম্পূর্ণভাবে স্মিথের নিজস্ব।

আরও একটি স্বনামখ্যাত লোকের সঙ্গে গ্ল্যাসগো অবস্থানকালে স্মিথ পরিচিত ছিলেন —তিনি হলেন জেম্স্ ওয়াট। জেমস ওয়াট তখন তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন স্টীম ইঞ্জিন সম্বন্ধে। গ্ল্যাসগো শহরে তাঁর কোথাও কারখানা খোলার অনুমতি মিললো না। অবশেষে য়ুনিভার্সিটিতে যন্ত্রনির্মাতার কাজ জুটিয়ে তাঁকে একটা আশ্রয় দেওয়া হোলো। এইভাবে জেমস ওয়াট ও অ্যাডাম স্মিথ এই দুটি লোক একই সঙ্গে একই জায়গায় এক একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন যদিও সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি ক্ষেত্রে।

তেরো বছরের অধ্যাপক জীবনে স্মিথ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করলেন। তিনি পড়াতেন ময়্যাল ফিলজফি। এই কথাটির দ্বারা তখন অনেক কিছুই বোঝাতো— এথিক্স্, থিওলজি, আইন এবং অর্থনীতি। শিক্ষণ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় তাঁর একটি সক্রিয় অংশ ছিল। স্মিথের ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে এই অধ্যায়টির গুরুত্ব অপরিসীম। বণিকশ্রেণী পরি-চালিত যে ধনতান্ত্রিক সমাজে তিনি জন্মেছিলেন এবং যার প্রতিভূ হয়ে Wealth of Nations লিখেছিলেন তারই একটি পীঠস্থান বলা যেতে পারে সেদিনকার গ্ল্যাসগোকে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাণিজ্যিক অগ্রগতির যে প্রবল বেগ সেখানে দেখা গিয়েছিল তা বিশেষভাবে স্মিথকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বেরোলো তাঁর প্রথম বই "Theory of Moral Sentiments." দার্শ-নিক তত্ত্বের দিক থেকে এ বই তেমন মূল্যবান নয় কিন্তু সাহিত্য হিসাবে এর মূল্য আছে। এই বই রচনার সঙ্গে সঙ্গে স্মিথের নাম ছড়িয়ে পড়লো। তারই ফলে তদানীন্তন ড্যাম্সেলার অফ দি এক্সচেকারের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এলো তাঁর পুত্রের শিক্ষকতা গ্রহণ করে তার সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণের জন্য। এর জন্য বাৎসরিক তিনশো পাউণ্ড পারিশ্রমিক ও শিক্ষকতা কাল শেষ হয়ে গেলে ঐ পরিমাণ অর্থ পেনশন ধার্য করা হোলো। এর পরের দু'বছর ইউরোপের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাটলো। এই সময় তিনি বহু খ্যাতনামা লোকের সংস্পর্শে আসেন যেমন ভলটেয়ার, দিদেরো ফিজিওক্র্যাটিক লেখক Turgot, Quesnay ইত্যাদি। পরবর্তীকালের রচনার জন্য প্রচুর তথ্য তিনি এই ভ্রমণ থেকে আহরণ করলেন। ফিরে এসে এগারো বছর তিনি জন্মস্থান কার্ককডিতে কাটালেন। এই সময়ই চললো 'ওয়েলথ অব নেশন' লেখার কাজ। মোট বারো বছর লেগেছিল বইটা লিখতে। তারও আগে বারো বছর লেগেছিল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে।

শেষ দু'বছর তিনি এডিনবরাতেই কাটিয়েছেন। এই সময় তিনি কাস্টম্স্ এ একটি চাকরী পেয়েছিলেন। পারিশ্রমিক ও পেন্সন মিলিয়ে তাঁর শেষের দিনগুলো বেশ প্রাচুর্যের মধ্যেই কেটেছে। প্রতি রবিবারে একটি নৈশভোজের আয়োজন করতেন তিনি। তাতে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিরা আসতেন। মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে স্মিথের ইচ্ছানুসারে তাঁর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির যেগুলো ভল্যুম পড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলা হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। জাতিগত বিরোধের জন্য কিনা জানিনা, স্মিথের মৃত্যুতে তখন ইংল্যান্ডে বিশেষ কোন আলোড়নই দেখা যায়নি। কিছু লোকের মনে সেজন্য ক্ষোভের সঞ্চার

হয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত কোমল এবং মার্জিত স্বভাবের লোক ছিলেন স্মিথ। সেই সঙ্গে অবশ্যি স্কট জাতিসুলভ খানিকটা একগুঁয়েমীও তাঁর ছিল। কোন ধারণা একবার জন্মালে তাকে একেবারে আকড়ে থাকতেন। তাঁর অন্যমনস্কতা সর্বজনবিদিত ছিল।

Wealth of Nations-কে অ্যাডাম স্মিথ একটি সর্বাঙ্গীন সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বই করতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে তাঁর অর্থতত্ত্ব সম্পর্কিত অংশগুলিই টিকে গেছে। বইটি সম্বন্ধে প্রথম লক্ষণীয় হচ্ছে তার সাহিত্যিক মূল্য। সুপণ্ডিত অ্যাডাম স্মিথের রচনার সর্বত্র পাণ্ডিত্য ও ভাষার বিন্যাসের ছাপ পাওয়া যায়। যে কোন বিষয় সম্পর্কে যুক্তি ও উদাহরণসহ চিত্তাকর্ষক আলোচনা করা হয়েছে।

Wealth of Nations সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত শুনতে পাওয়া যায়। M' Culloch এই বইটি সম্বন্ধে বলেছেন ".....exercised a power and beneficent influence on the public opinion and the legislation of the civilised world, which has never been attained by any other work". জে, বি, সে বলেছেন "Read Adam Smith as he deserves to be read and you will perceive that before him no political economy existed", আবার রাস্কিন অ্যাডাম স্মিথ সম্বন্ধে বলেছেন "the half-bred and half-witted Scotchman who faught the deliberate flasphemy. "Thou shalt hate the Lord, thy God, damn his laws and covet his neighbours goods".

Wealth of Nations-এর মূল্য যাচাই করতে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে স্মিথের যুগ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অভ্যুত্থানের যুগ। জমিদারশ্রেণীর প্রাধান্যকে খর্ব করে বণিকশ্রেণী তখন সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে বসেছে। বাণিজ্যবিস্তারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বুটেন অর্থ আহরণ করে আনছে। শিল্পবিপ্লব তখনও দেখা দেয়নি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কুফলগুলিও প্রকাশ পায়নি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জয়জয়কার দেখেছেন স্মিথ চারিদিকে। তাই তিনি ছিলেন laissez-faire এর ধ্বজাবাহক— অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিব্যারেলিজমের জন্মদাতা। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে যথাসম্ভব কম রাখবার প্রয়াসী তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের উপর তাঁর আস্থা অসীম। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে খর্ব করবার এই প্রচেষ্টার মূলে আছে স্বাভাবিক নিয়মের উপর স্মিথের বিশ্বাস ও তাঁর আশাবাদী মনোভাব। তিনি বলেছেন কোনরকম কৃত্রিম বিধিনিষেধ আরোপ না করে যদি প্রাকৃতিক বিধানের হাতে সমাজব্যবস্থাকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আপনিই সামঞ্জস্য আসে। প্রত্যেকটি মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর। কিন্তু আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধি করতে গিয়েও তারা যেন একটি অদৃশ্য শক্তির বিধানে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু যুক্তিবাদী স্মিথ একথাও মেনে নিয়েছেন যে এই ধারণা কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য, যেমন তিনি একচেটিয়া ব্যবসার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং সেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তপ্রয়োগকে সমর্থন করেছেন। আবার স্বাভাবিক সামঞ্জস্যে বিশ্বাসী হলেও শ্রেণীগত বিরোধের সম্ভাবনাকে তিনি একেবারে উপেক্ষা করেন নি। ক্যাপিটালিজমের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও সেই সঙ্গে চাষীজমিদার সংঘর্ষের স্বরূপ তাঁর নজরে পড়েছিল। জমিদার শ্রেণী সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন যে তারা—"love to reap where they never sowed." আবার তিনি বলেছেন ক্যাপিটালিস্টরা শ্রমিককে কাজ করবার জন্য যে যন্ত্রপাতি দেয় তার বিনিময়ে কিছু আশা করে। দুটো শ্রেণীই

পরস্পরের কাছ থেকে আরও বেশী আদায়ের চেষ্টা করে এবং উভয়ে উভয়কে বাধা দেয়। মনে রাখতে হবে এই শ্রেণীসংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে শিল্পবিপ্লবেরও আগে, যখন শ্রেণীবিরোধ এত খোলাখুলিভাবে দেখা দেয়নি। তবে এই বিষয়টি তাঁর লেখায় মুখ্য অংশ গ্রহণ করেনি বলেই ক্যাপিটালিস্ট ব্যবস্থা ও স্বাভাবিক নিয়মের উপর তাঁর আস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাঁর রচনার একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করে আছে বিনিময় ব্যবস্থা ও মূল্যনিরূপণ। এখানে তিনি তাঁর পূর্বানুগামীদের ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়েছেন। এর আগে পর্যন্ত অর্থনীতিতে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল উৎপাদনব্যবস্থা। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার চরম লক্ষ্য যে ভোগকারীর প্রয়োজন সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্মিথ। দ্রব্যমূল্যের উৎস নিরূপণের চেষ্টা তাঁর আগেই করেছিলেন মার্কেন্টাইল ও ফিজিওক্র্যাটরা। প্রথমোক্তদের মতে বিনিময়ের মধ্য দিয়েই মূল্যের উদ্ভব। কিন্তু বিনিময় বলতে তাঁরা শুধু বৈদেশিক বাণিজ্যকেই বুঝেছেন। আর ফিজিওক্র্যাটরা উৎপাদনকরী শ্রম বলে একমাত্র চাষবাসকেই মর্যাদা দিয়েছেন, শিল্পবাণিজ্য তাঁদের কাছে ছিল অপাংক্তেয়। তাই মূল্যের উদ্ভব কেন হয়, বিশেষ করে একটি শিল্পপ্রধান সমাজে, এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর তাঁরা দিতে পারেন নি। স্মিথ ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যাটির আলোচনা করেছেন। অবশ্যি মূল্যতত্ত্ব সম্বন্ধে স্মিথের নিজের মতবাদ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। প্রথমতঃ মূল্যনিরূপণ করতে যোগান ও চাহিদা যে দুটি শক্তির প্রয়োজন হয় তার মধ্যে চাহিদার দিক তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন মূল্য নির্ধারিত হয় উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের দ্বারা অর্থাৎ যোগানের শক্তি দ্বারা। চাহিদার কোন ভূমিকা এখানে নেই। তাই উপযোগ (use-value) ও বিনিময় মূল্যের (exchange-value) পার্থক্যের রহস্যটা তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তার কারণ সঠিক নির্ণয় করতে পারেন নি। পরে এই পার্থক্যের থেকেই প্রান্তিক উপযোগের (marginal utility) ধারণা জন্ম নিয়েছে।

স্মিথের মতে দ্রব্য উৎপাদন নিয়োজিত শ্রমই হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের উৎস ও পরিমাপ। সুতরাং নিয়োজিত শ্রমের মূল্য উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সমান হওয়া উচিত। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কখনও তা হয় না। শ্রমিককে তার শ্রমের বিনিময়ে যে মূল্য দেওয়া হয় তা উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় মূল্য অপেক্ষা কম। এই সমস্যাকে স্মিথ এই বলে এড়িয়ে গেছেন যে এই মূল্যনিরূপণতত্ত্ব প্রযোজ্য হবে "in that early and rude state of society which precedes both the accumulation of stock and the appropriation of lands". অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজে যেখানে উৎপাদনের উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন সেখানে এই তত্ত্ব প্রযোজ্য নয় একথা স্পষ্টই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

ভূমি ও মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতাকে পরোক্ষভাবে মেনে নিয়ে মূল্য নিরূপণের উপর উৎপাদন খরচের যে প্রভাব তার খানিকটা আভাস দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারও কোনও বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। ঐ সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে লেবার থিওরীকে মুক্ত করে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজে তাকে প্রয়োগ করবার এবং তার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন রিকার্ডো, যদিও তিনি সম্পূর্ণ সফল হন নি। পরে মার্ক্স Surplus value-র ধারণা সৃষ্টি করে এই মতবাদকে নূতন মর্যাদা দিয়েছেন।

স্মিথএর শ্রেণীসংঘর্ষের ধারণা এবং লেবার থিওরী যতই অসম্পূর্ণ হোক না কেন। একথা মানতেই হবে যে ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধগুলির প্রথম আভাস তিনিই দিয়েছিলেন। সুতরাং সোশ্যালিজমের অগ্রদূত স্মিথকে বললে খুব অন্যায় হবে না। একথাও মনে রাখতে হবে যে স্মিথের আক্রমণ ছিল সমাজের কায়েমী একটি অলস শ্রেণীর স্বার্থের

বিরুদ্ধে যারা বিনা আয়াসে পরশ্রমনির্ভর হয়ে জীবন যাপন করে। তিনি কৃষক ও মজুর শ্রেণীর স্বার্থকেই সমর্থন জানিয়েছেন।

কিন্তু শিল্পনির্ভর আগামী দিনের অগ্রদূত স্মিথকে বলা চলে না। উৎপাদনশীল কাজ হিসাবে কৃষিকেই তিনি বড় করে দেখেছেন। সেখানে স্মিথ ফিজিওক্র্যাটদের প্রভাবমুক্ত নন। উৎপাদনশীল কাজ বলতে তিনি এমন কাজ বুঝিয়েছেন যেখানে পরিশ্রমের ফল সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায় না। কথাটা ফিজিওক্র্যাটদের produit net-এর ধারণা যে একমাত্র কৃষিতেই এমন দ্রব্য সৃষ্ট হয় যা আগে ছিল না— তাকে স্মরণ করিয়ে নেয়। বণিক ও শিল্পপতিদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন না।

বন্টনব্যবস্থা নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। সেখানে রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের পূর্বাভাস দেখতে পাই কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়নি। সুদ, মুনাফা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়।

আগেই বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের তিনি একজন মস্ত বড় সমর্থক ছিলেন। অর্থপ্রসঙ্গ নিয়েও তিনি সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। আর taxation সম্বন্ধে তাঁর canon গুলো তো আজ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য। শ্রমবিভাগ সম্বন্ধে তিনি হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন। স্মিথের লেখা আশ্চর্যরকম প্রত্যক্ষ ফল বিস্তার করেছিল সারা ইউরোপে। তদানীন্তন শাসকদের হাতে তাঁর ধারণাগুলো বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় তাঁর লেইসে ফেয়ার ও অবাধ বাণিজ্যনীতির রূপায়ণে। প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থের টাক্স-ব্যবস্থার পেছনে রয়েছে স্মিথের প্রভাব। তার চেয়েও বেশী করে স্মিথের ধারণাগুলিকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করেছেন উইলিয়াম পিট। ছাত্রাবস্থা থেকেই স্মিথের লেখা পিটের মনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল এবং প্রধান মন্ত্রী হবার পর তিনি স্মিথের ধারণাগুলিকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারই নিদর্শন হচ্ছে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের Treaty of Eden— ফ্রান্সের সঙ্গে প্রথম অবাধ বাণিজ্য চুক্তি। কবডেন ও ব্রাইটের প্রতিষ্ঠিত ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল স্মিথের ধারণাগুলোকে ভিত্তি করেই এগিয়েছে। শুধু ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স কেন, আরও অনেক দেশই আইন প্রণয়নের পেছনে স্মিথের মতবাদ কাজ করেছে। Wealth of Nations বইটি প্রচুর সম্মান পেয়েছে। স্মিথেরই জীবদ্দশায় এর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর বহু ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে।

Wealth of Nations এর অনেক ত্রুটি আছে সন্দেহ নেই। বইটির অসম্বদ্ধতা ও কোনও কোনও জায়গায় ভুলত্রুটি থাকার জন্য এর মূল্য খানিকটা কমে গেছে। তাছাড়া অনেক জায়গায় জটিলতা পরিহার করতে গিয়ে তিনি অনেক প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে গেছেন। তারই ফলে তাঁর ধারণার চিরস্থায়ী মূল্য নষ্ট হয়ে গেছে।

মোট চব্বিশ বছর লেগেছিল যে বইটি সম্পূর্ণ করতে, তার সম্বন্ধে কয়েক পৃষ্ঠায় সব কথা বলে শেষ করা যায় না। সুতরাং; সে চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে দুএকটি কথা তাঁর সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। স্মিথের বিচ্ছিন্ন ধারণাগুলির মধ্যে হয়তো ত্রুটি ছিল, কিন্তু তিনি যা দান করে গেছেন, তার মর্যাদা সেজন্য একটুও কমে না। অর্থনৈতিক চিন্তার যেদিকেই তাকাই, দেখি স্মিথ সে সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলে গেছেন। তাঁর বক্তব্য যেমনই হোক, নূতন নূতন চিন্তার স্রোতকে তিনি উন্মুক্ত করে গেছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির জগতে তাঁর প্রভুত্ব ছিল অপ্রতিহত। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে যে আজকে অর্থশাস্ত্র যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তা স্মিথকে বাদ দিয়ে কতখানি সম্পূর্ণ হোতো বলা কঠিন।

উপন্যাস ও নাটক

নিতাই বসু

সাহিত্যিকের ভাব-প্রেরণা সাহিত্যের বিচিত্র রূপের বা 'ফর্ম'-এর মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করে, যেমন নাটক, উপন্যাস মহাকাব্য, গীতিকাব্য, ছোটগল্প ইত্যাদি, কিন্তু ভাববস্তুর আরোপের দিক দিয়ে এই বিচিত্র বিভাগের কোনটিতে কতোখানি আরোপ করা চলে তা পরে বিচার করলেও নাটক ও উপন্যাসের প্রকৃতিগত পার্থক্য আমাদের বিচার করতে হবে। একটি বিশিষ্ট ধারা অথবা প্রণালীতে এই বিচার ও বিশ্লেষণকে সুসংহত রূপ দিতে গেলে আমাদের প্রধানতঃ কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করতে হবে—উৎপত্তি, সংজ্ঞা, স্বরূপ (প্রযুক্তি-বিশ্লেষণ), ক্রমবিকাশ, বিচার পদ্ধতি।

মহাকাব্যের মাধ্যমে কোনো বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের এক সার্বিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব এবং এরই ফলে স্রষ্টার আপন হৃদয়ের ভাবনা-চেতনা-অনুভূতি একটি বিশেষ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অধুনা বিশ্বের সর্বত্র মহাকবি জনোচিত প্রতিভার যেমন অভাব দেখা যায়, তেমনি একথাও ঠিক মহাকাব্যের মন্থরতা আজ দ্রুতগতির যুগে ততটা আদরণীয় নয়। যাযাবর তাঁর 'দৃষ্টিপাত' বইটির এক অংশে বলেছেন—বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। এই আবেগ বা ইমোশানকে আমাদের মনো-জগত থেকে নির্বাসন দিয়ে, বর্তমানবস্তু-তান্ত্রিক বিশ্বের অবক্ষয়ের জয়গানে, ক্ষয়িষ্ণু মানব-সমাজ ও তার সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃত চেহারাটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে উপন্যাস ও নাটকের মাধ্যমে সাহিত্যশিল্পীরা সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। আমাদের হৃদয়ের এই আবেগবিহীনতা উনিশ শতকের শুরু থেকেই যেন প্রকট হয়ে উঠেছে এবং এই জড় জগতের গন্ডীর মধ্যে আমরা আমাদের সকল কামনা বাসনাকে বিধৃত করে বস্তুতান্ত্রিকতার জয়গান করছি। বর্তমান যুগের এই নাটক ও উপন্যাসের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের দৃষ্টিকে অতীতের দিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। 'কাব্যেষু নাটকম্'—প্রকৃত নাটক কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-প্রাচীন সংস্কৃত-আলংকারিকেরা এইমত পোষণ করতেন। 'জাতির প্রকৃতি প্রবৃত্তি, আশা, আকংখা, উদ্দীপনা ও সমাজের মনোবেদনা ধর্মের তত্ত্ব, দর্শনের তথা, যিনি নাটকীয় কল্পিত চরিত্রের ভিতর দিয়া ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে রসের বর্ণচ্ছটায় দর্শকের হৃদয়াকাশে আদর্শের বিকাশ করিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠকবি ও তাহার সৃষ্ট সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।' (বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত ঃ হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত)

সত্যই নাটকের সৃষ্টিতত্ত্বের মূল বিশ্লেষণে এই মতবাদই সব চেয়ে বেশী পরিমাণে বিশ্বের সব শ্রেষ্ঠ নাটাকার সম্পর্কে অল্পাধিক প্রযোজ্য হবে—একথা আমরা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে পারি। কিন্তু উপন্যাস রচনার প্রেরণায় এমন কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। তবে উপন্যাস লেখার শুরু প্রকৃতপক্ষে কবে হয়েছিলো, তা' পণ্ডিতেরা একমত হয়ে বলতে পারেন নি। যদিও সকলেই স্বীকার করেছেন যে উপন্যাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি। প্রাচীন সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে আমরা যেসব রচনা দেখি, সেখানে উপন্যাস-লক্ষণের কোনো সৃষ্টি আমাদের মনে সাড়া না জাগালেও, আমরা একথা অনায়াসে স্বীকার করতে পারি যে, বর্তমানে উপন্যাসের

যে বিচিত্র রূপায়ন আমরা লক্ষ্য করছি, এর যথেষ্ট উপাদান প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে পাওয়া যায়। 'নাটকে শুদ্ধ নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কথাবার্তা কহেন। সমস্ত ভাব, সমস্ত কার্য এই ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার অন্তরালে থাকিয়া এই সকলব্যক্তিদিগকে পরিচালিত করেন। গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের প্রায় সাক্ষাৎ হয় না। কথাগ্রন্থ এই উভয়ের মধ্য-স্থলবর্তী।' (নভেল ও কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য ঃ চন্দ্রনাথ বসু) একথা অনস্বীকার্য যে নাটক ও উপন্যাস সৃষ্টি সময়ে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক এই নীতিকে অনুসরণ করে চলেন। ভারতীয় নাট্যকলার বীজ, বেদ ও উপনিষদাদি বইয়ে প্রচুরভাবে দেখা যায়। নাট্যবেদ তখন পঞ্চম বেদ রূপে কথিত হতো। নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন যুগের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষই প্রাচীন নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ বিকাশ-ভূমি। 'ভারতের নাট্যশাস্ত্রই প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরীতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক প্রভৃতি ভারতখ্যাত তথা বিশ্ববিখ্যাত কবি ও নাটাকারেরা নাটককে কেমন ভাবে পঞ্চম বেদ রূপে স্বীকৃতি দিতেন, নিম্নোক্ত উক্তিটির ভিতর দিয়া ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে— 'As Christian principle rests on the precepts of the Church, and as the English Law is administered in agreement with precedent, so the Sanskrit Theatre has conformed to the rules laid down by the Bharata sutras. They were held almost scared by Kalidasa and other dramatists'. (Indian Theatre: E. P. Horrwitz, Page 30-31) 'ভারতীয় নাট্যকলা ভারতের নিজস্ব, ভারত ইহার জন্যে কাহারও নিকট ঋণী নহে। নাটকের যবনিকাও হিন্দুর সৃষ্টি। উপন্যাস জীবনের বিচিত্র ধারার ক্রমবিবর্তনের ফলে ক্রমবিবর্তিত হইতে হইতে চলিয়াছে।' 'উপন্যাসের প্রথম যুগে বস্তুতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব মনোবৃত্তিই পূর্ণমাত্রায় প্রকট। ক্রমশঃ ইহার রূপ ও গঠন বৈশিষ্ট্য স্থিরীকৃত হইলে কাব্যধর্মী মনোভাব, সূক্ষ্ম কবিত্বময় অনুভূতি, জীবনের রহস্যময়, উচ্চ সুরে বাঁধা ভাবরাজি উপন্যাসের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার বাস্তবভিত্তির উপর নিজ আসন দৃঢ় করিয়া লইল। তা ছাড়া দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের ধারণারও বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে আমরা ইহার দ্বারা কতকগুলি স্থূল, প্রয়োজনমূলক, সহজ-বোধ্য মনোবৃত্তিকেই বুঝিতাম। এখন ইহার গভীরতা ও পরিধি বিস্তৃত হইয়া ইহার মধ্যে প্রায় সমস্ত আদর্শ-লোকই, জীবনের অতীন্দ্রিয় রহস্য ও জটিল, ক্ষণিক ধরা ছোঁয়ার অতীত আশা আকাংখাগুলিই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—' (বাংলা সাহিত্যের কথা ঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

নাটক ও উপন্যাসের উৎপত্তি সম্পর্কে একটিমাত্র কথা আলোচনা করে অনাপ্রসঙ্গে আলোচনা করতে আরম্ভ করব। প্রাচীন ও মধ্যযুগের আখ্যানমূলক কাহিনী এবং ঘটনা সকল যেমন বর্তমান উপন্যাসের সূত্রপাত সৃষ্টির সহায়তা করেছে তেমনি সমবেত সংগীত বা Chorus থেকে গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব। Aristotle বলেন যে গ্রীসে বেকাস্ (Bachus) দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে যে সকল গান গাওয়া হতো সেই সব গানই ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ফলে গ্রীক নাট্য সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। খৃঃ পূঃ ৫৩৬ সালে থেস্পিস সংগীতময় আলেখ্যর মধ্যে কথোপকথনের সৃষ্টি করে আধুনিক নাট্যরীতির প্রথম প্রবর্তন করেন কিন্তু এর মধ্যে অভিনেতা থাকত মাত্র একজন। কিছুদিন পরে Frinichus তাঁর 'Capture of Miletus' নাটকে অভিনেতার স্থানে একজনমাত্র অভিনেত্রীর অবতারণা করেন এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীর যুগপৎ আবির্ভাব এইভাবে প্রথম সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃতে 'কাদম্বরী', 'দশকুমার চরিত' ইত্যাদি আখ্যায়িকামূলক হলেও এগুলিকে উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যায় না। এবং ইংরেজী সাহিত্যেও

Defoeর সময় হতে বর্তমান প্রকারের কথাগ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু হয়। যেহেতু উপন্যাস নাটক নয় সুতরাং এখানে অভিনেতা অভিনেত্রীর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। 'আমাদের দেশে বঙ্কিমবাবু হইতে কথাগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এই কথাগ্রন্থ ইংরেজী কথাগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুকরণ।' (নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য ঃ চন্দ্রনাথ বসু) বঙ্কিমচন্দ্র 'ইংরেজী কাব্যগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুকরণ' করে উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন কিনা এবিষয়ে আমাদের দ্বিমত থাকলেও বঙ্কিম যে আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের জনক একথা অবিসংবাদিত চিত্তে আমরা স্মরণ করতে পারি। নাটক ও উপন্যাসের উৎপত্তি আলোচনা শেষ করে এই উভয়রীতির সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করবো।

আমাদের দেশে নাটকের সংজ্ঞা করা হয়েছে 'দৃশ্যকাব্য'—এখানে 'দৃশ্য' শব্দটির অর্থ অভিনেয়, 'তত্রাভিনেয়ম দৃশ্যম।' কাব্যের বিভাগ তিনটি— ১। গীতিকাব্য ২। শ্রব্যকাব্য ৩। দৃশ্যকাব্য— সুতরাং যে কাব্য অভিনেয় তার নামই নাটক এবং এই ব্যাখ্যাই মনে হয় তাৎপর্যপূর্ণ। একে রূপক হিসেবেও ব্যবহৃত করা হয়েছে। (সংস্কৃতে নাটক অর্থে রূপক) 'অভিনয়ের চারিটি প্রধান অঙ্গ যথা,— আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। আঙ্গিক অভিনয়ে অভিনেতাকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনায় ভূমিকাটির রস ও ভাবানুযায়ী অভিব্যক্তি ফুটাইয়া তুলিতে হয়। বাচিক অভিনয়ে চরিত্রানুরূপ আবৃত্তি করিয়া চরিত্রটির অভিব্যক্তি দেখাইতে হয় ('The best art is to conceal art') + + আহার্য অভিনয়ে দৃশ্য ও পোষাক চরিত্র ও ভাবাভিব্যক্তিতে সহায়তা করিবে। + + সাত্ত্বিক অভিনয়ই সর্বাপেক্ষা কঠিন। ইহাতে যেমন স্বাভাবিক বা কলাসম্মত কথা বলিতে হইবে, যাহার যেরূপ কথা বলিতে হইবে তাহাও হস্তপদ সঞ্চালন স্বাভাবিক ভাবে করিতে সেইরূপ ভাবগভীরতা অভিব্যক্ত হওয়া চাই। ভাবসম্পদ সম্বলিত স্বাভাবিক অভিনয়ই সাত্ত্বিক অভিনয়।' (বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত ঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) 'Theory of Drama' গ্রন্থে নিকল নাটকের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন— 'Drama is an expression of ideas of life in such a manner as to render that expression capable of interpretation by the actors'.

কালীপ্রসন্ন ঘোষ নাটক সংবন্ধে বলেছেন যে, 'অধিনায়ক বা অধিনেতৃ বিশেষের সংসার তাড়নায় বা পরকীয় আবেগ সমষ্টির উত্তেজনায় যে চরিত্রগত পরিবর্তন ও পরিণাম হইয়া থাকে তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের উদ্দেশ্য।' তবে এই সংজ্ঞাটি যথাযথ বলে আমাদের মনে হয় না, এটা সাধারণতঃ স্থূলে এবং এই দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে নাট্যবিশারদ নিকলের মন্তব্যই অধিক যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয়।

যদিও নাটকের মতো উপন্যাস গদ্যে লিখিত হয়, তবুও ঔপন্যাসিকেরা মানবজীবনের সুদীর্ঘ কাহিনীকে রূপায়িত করেন উপন্যাস মাধ্যমে—এখানে জীবনের তুচ্ছ ঘটনাকেও বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, যা পরিহার করা নাট্য-রচনা-রীতির একটি বিশেষ ধর্ম। আখ্যান ভাগ অথবা চরিত্রসৃষ্টি—এই উভয়ের মধ্যে কোনটি যে ঔপন্যাসিকের গ্রাহ্য হওয়া উচিত এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে— কিন্তু একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, নাটকে চরিত্র সৃষ্টিই মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন কালের সমালোচক ও গল্পলেখকগণ গল্পকেই প্রাধান্য দিতেন উপন্যাস-রচনার বাহন হিসেবে কিন্তু আধুনিক কালে চরিত্র সৃষ্টিকেই মুখ্যস্থান দেওয়া হয়েছে এবং এদিক দিয়ে আধুনিক নাটক ও উপন্যাসের সংকীর্ণ পরিধি ছাড়িয়ে একে অন্যের সমগোত্রীয় ও সমধর্মী

হয়ে পড়েছে। আধুনিক এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের মতে উপন্যাসের উদ্দেশ্য গল্প বলা নয়, চরিত্র সৃষ্টি নয়, মতবাদের প্রচারও নয়। 'সচেতন ও অবচেতন আত্মার উপরে বাহিরের ঘটনা আঘাত করিলে যে সকল নিগূঢ় অনুভূতি জাগে তাহার অভিব্যক্তিই উপন্যাসের কাজ'। (শরৎচন্দ্রঃ সুবোধ সেনগুপ্ত) Virginia Wolf, James Joyce ইত্যাদি এই ধরণের সাহিত্যশিল্পী। উপন্যাসের সংজ্ঞা মোটামুটি এরূপ জীবনের একটা সমগ্র ও অখণ্ড রূপকে নিয়ে শিল্পী যখন আপন আদর্শের সংগে বস্তুতান্ত্রিক বিষয়বস্তুকে আনন্দঘন রসরূপে রূপায়িত করেন গদ্যের মাধ্যমে, তখনই সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি হয় এবং সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হলেও এতে মানুষের সুখ-দুঃখের আশা-আকাংখার কথা শিল্পরূপ লাভ করে।

নাটক ও উপন্যাসের সংজ্ঞা বিশ্লেষণে যে সব কথা বলেছি, তার মাধ্যমে এই বিশেষ সৃষ্টি দুটির স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হব। প্রতিভা মানুষের স্বাভাবিক শক্তিরই বিকাশ—জ্ঞান, কল্পনা, ও কর্মশক্তিরই বিশেষ সংযোগ ও অভিব্যক্তি।

'ইচ্ছা, জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন
তিনির তিন শক্তি মেলি প্রপঞ্চ রচন। চৈতন্য চরিতামৃত

এমন কোন মানুষ নেই যার মধ্যে জ্ঞানবৃত্তি -অনুভব বৃত্তি' কল্পনাবৃত্তি এবং কর্মবৃত্তির ক্রিয়া একেবারেই অসৎ। প্রকাশের আবেগ জীবনের আবেগের সংগে এক হয়ে মিশে আছে—যেখানে জীবন সেখানেই কর্ম (Willing) সেখানেই অনুভব (Feeling) এবং সেখানেই জ্ঞান (Knowing)।

কবি বা শিল্পীরা এই জ্ঞান-কর্ম-অনুভবের বিশেষ শক্তির অধিকারী তথা 'নব নব উন্মেষ শালিনী বুদ্ধির' অধিকারী। প্রত্যেক প্রথিতযশা নাটকার ও খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের এই কবি-মানস থেকেই এবং তারতম্যভেদে ও প্রতিভার আপেক্ষিকত্বে কেউ বা বিশিষ্ট সাহিত্য শিল্পী বলে খ্যাত হন। সাধারণতঃ ইচ্ছাশক্তি বাসনারূপে নিয়ন্ত্রিত করে বিষয়বস্তু নির্বাচন ঘটনা বা চরিত্রের পরিণাম; আর জ্ঞান-অনুভবে প্রকাশ পায় জীবন সমালোচনার এবং জীবনের সহিত জীবন যোগ করার সামর্থ্য। 'বস্তুত কবি প্রতিভার বিচার, শেষ পর্যন্ত কবির জীবন-সমালোচনা-বৈশিষ্ট্যের' এবং 'জীবনের রূপ' সৃষ্টির সামর্থ্যের বিচার। বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে শিল্পীর বাসনায় বা অভিযোজন ভঙ্গীর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।' (নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচারঃ সাধন ভট্টাচার্য)। এমন কি বাহ্য প্রেরণায় কবি যেখানে ভিন্ন বিষয়বস্তু নির্বাচনে বাধ্য হন সেখানেও কবির জীবন-সমালোচনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না পেয়ে যায় না।

অবশ্য শুধু বিষয় বস্তু নির্বাচনের মাধ্যমে মনোভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যায় না কি নাটকের ক্ষেত্রে, কি উপন্যাসের ক্ষেত্রে। জীবনের রূপরসের আস্বাদ সৃষ্টির ক্ষমতা যাঁর যত বেশি তিনি তত বড় নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক।— যে নাটকে বা উপন্যাসে জীবনের রূপগত এবং রসগত মায়া ঘোর (illusion) যত কম বা যত ব্যাহত, তা ততো হেয় বা লঘু। কারণ সৌন্দর্য সেখানেই প্রমূর্ত, যেখানে ভাব ও রূপের মধ্যে বাগর্থের মত সম্পত্তি বিরাজ করে।

এখন নাটক ও উপন্যাসের প্রযুক্তি বিশ্লেষণ করে উভয় রীতির পার্থক্য নির্ধারণের চেষ্টা করব। যদিও Shakespeare তাঁর নাটকে Unity of time, Unity of place ও Unity of action কে মেনে চলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি সর্বদা নাটকে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে যথারীতি অনুসরণ করে চলতে পারেন নি। ঔপন্যাসিককে এ ধরণের কোনো প্রচলিত রীতিকে অনুসরণ করতে হয় না— তিনি তাঁর জীবনদর্শনকে বিচিত্র ভাবে উপলব্ধি করে উপন্যাসের মধ্যে রসরূপ দান করতে পারেন, নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর যে কোনো ঘটনাকে তাঁর সম্পূর্ণ ভাবে রূপায়িত করার অধিকার আছে। উপন্যাসে নাটকের মতো পাত্র পাত্রীর সংলাপে কেবলমাত্র ঘটনার develovment বা বিকাশ সাধন করা হয় না, পরন্তু লেখক নিজেও তাঁর বোধ ও বোধির, চিন্তা ও অনুভূতির, ভাব ও ভাবনার যথেষ্ট ব্যক্তিগত প্রকাশ ঘটিয়ে কাহিনীর পুষ্টিসাধন করতে পারেন। নাটকে কিন্তু আমরা dramatist's criticism or interpretation of life-কে কোনো বিশেষ পাত্র বা পাত্রীর সংলাপের মধ্যে খুঁজি। কিন্তু নাট্যকার যদি সেখানে মুখ্যস্থান অধিকার করেন, তা হলেই সেখানে নাট্যরস-সৃষ্টি ব্যর্থতার নামান্তর মাত্র। "শিল্পসৃষ্টির অন্তরালে যে শিল্পীটি বিরাজ করিতেছে, জীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টি ভঙ্গী, মানবের আনন্দবেদনায় তাহার সহানুভূতি, এক কথায় তাহার জীবন-দর্শনের প্রকাশ তাহার রচিত সাহিত্য-কলায়। এই জীবনদর্শন সাহিত্য-রচনার মধ্যে আপনাকে সর্বত্রে প্রচার করে না, করিলে তাহা প্রোপাগান্ডা হইয়া দাঁড়ায়, আমাদের রস বোধকে ক্ষুন্ন করে, ইহা রচনার মধ্যে অলক্ষ্যে বিরাজ করে এবং জীবনের যে সমস্ত সমস্যা ও বহুবিচিত্ররূপ উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করে তাহাদেরই মধ্য দিয়া জীবনের প্রতি ঔপন্যাসিকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর আমরা পরিচয় পাই।" (বাংলা সাহিত্যের আলোচনা ঃ মদনমোহন কুমার) এই 'দৃষ্টিভঙ্গীটি' কেবলমাত্র উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সংলাপের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় না, লেখক নিজেও বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনার মাধ্যমে একে উপন্যাসে রূপায়িত করেন।

নাটকের প্রযুক্তি সম্পর্কে ইবসেনের পূর্ববর্তী নাট্যকারেরা যে নীতিই অনুসরণ করুন না কেন, ইবসেনের আবির্ভাবের পরেই নাট্যরচনার প্রযুক্তি সম্পর্কে দুটি বিশেষ রীতি প্রবর্তিত হয়—১) 'There are no villains and no heroes' ২) The more familiar the situation the more interesting the play'. এই প্রযুক্তি দুটি সম্পর্কে এটুকুমাত্র বলা যায় যে, 'villain' এবং 'hero' কেবলমাত্র নাট্যোল্লিখিত পাত্র বিশেষকেই বুঝায়। উপন্যাস কোন একজন বিশেষ নায়ক চরিত্র অবলম্বনে রচিত হলেও এখানে 'villain' বা 'hero' বলে কোনও কিছু কল্পিত হয় না। আর ঊনিশ শতক হতে সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রচিত হলেও প্রাচীন কোনও ভাববস্তুকে আহরণ করেই, তা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও জনশ্রুতিমূলক হোক না কেন, উপন্যাস রচিত হয়েছে। অবশ্য এই যুগে যে তথাকথিত দু' একখানি সার্থক সামাজিক উপন্যাস সৃষ্ট হয়নি, তা নয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হতেই বিশ্ব-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় সমাজ-সচেতনতা শিল্পীমানস-অনুভূতিকে এমন আচ্ছন্ন করে তুলেছে যার ফলে এই যুগের সৃষ্ট সাহিত্য অনেকটা প্রচারধর্মী হয়ে পড়লেও যেন আমাদের কাছে more 'familiar'.

উপন্যাস ও নাটক রচনায় গ্রন্থের কোনো আকৃতি-লক্ষণকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়নি। পৃথিবীর বৃহত্তম নাটক "ওমাস হার্ডি" 'দি ডায়নেট' পাঠ করলে দেখা যায়, আকৃতিতে তা যেন মহাকাব্যকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। আবার এক হাজার অথবা দেড় হাজার পাতার উপন্যাসের অভাব ইংরেজী সাহিত্যে নেই— ইংরাজেরা বোধহয় স্ফীতকায় উপন্যাসের পক্ষপাতী, যার ফলে তারা বঙ্কিমের উপন্যাসের মর্যাদা না বুঝে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' এর লেখককে অধিক মর্যাদা দান করেছিল।

অধিকাংশ নাটকে পাঁচটি অংশ থাকে মুখ-সন্ধি (এক্সপজিসন), প্রতিমুখ সন্ধি (রাইজিং

একসন), গর্ভ সন্ধি (ক্লাইমেক্স) বিমর্ষ সন্ধি (ফলিং একসন) এবং উপসংহৃতি (ক্যাটাসট্রপি), অধিকাংশ নাটকের একশ্‌ন বা গতির ক্রমবিকাশ এর উপরে নির্ভর করে, যদিও সব নাটকে বিশেষতঃ অধিকাংশ আধুনিক নাটকে এই রচনা রীতি অনুসৃত হয় না। উপন্যাসে এমন কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই। তবে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাকালে ঔপন্যাসিক প্রথম পরিচ্ছেদে ভূমিকাস্বরূপ কাহিনীর উৎস সংবন্ধে কিছু বলেন ও পরিশিষ্টে অনেকজায়গায় উপসংহৃতিকে দীর্ঘায়িত করেন।

উপন্যাস ও নাটকের উৎপত্তি বর্ণনাকালে, উভয়ের ক্রমবিকাশ সংবন্ধে সাধারণ আলোচনা করলেও বর্তমানে বিস্তারিত আলোচনা করব। পূর্বেই বলেছি— উপন্যাসের তুলনায় নাট্য-কলার উদ্‌ভব অনেক প্রাচীন। নাটকের সুসংহত ও সুন্দর গঠনভঙ্গী প্রথমে ধরা দিয়েছিল গ্রীক নাট্যকারদের হাতে। The Persians, seven before Thebes, the Chophoroe of Electra, Epimenides or Furies, The Prometheus bound, The Fire bringing Prometheus and Prometheus Unbound প্রভৃতি গ্রন্থের নাট্যকার Aeschylus; Antigone, The Electra, The Oedipus Tyranus, Philocletes, Ajax ও Pracpinise প্রভৃতি নাটকের স্রষ্টা Sophocles: The Electra, Iphigenia in Aulis, Media, The Mad Iphegrinia in Tauris, Hercules এবং The Cyclops নাটকের নাট্যকার Euripides; Peace, Clouds The Frog প্রভৃতির লেখক নাট্যবিদ Aristophanes প্রভৃতির উল্লেখ-যোগ্য রচনায় এবং প্রতিভা বৈগুণ্যে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে নাট্যকলার বিশেষ উন্নতি হয়। এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত Susarian (580 B. C) হতে সূত্রপাত করে Epicharmus ও Aeistophanes এর মধ্য দিয়ে কমেডির যে ধারা প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রধান উপাদান ছিল হাস্যরস ও ব্যঙ্গ। যদিও নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু এই বিশেষ ধারাটিকে নিজের নাট্যরচনা-পদ্ধতিতে কার্যকরী করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও পাশ্চাত্ত্য-ভাবাদর্শ সম্পন্ন সেই সব নাটকের সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুদের নাট্যরচনা রীতির পার্থক্য দেখা যায় —And to pass to the other extremity of the world, among the Indians, whose social institutions and mental cultivation descend unquestionably from a remote antiquity, plays were known long before they could have experienced any foreign influence. It has lately been made known to Europe that they possess a rich dramatic literature, which goes backward throug nearly two thousand years' (Dramatic Art and Literature by Augnstus William Schlegel in 1879) শ্লেগেল-এর মতে রোমানগণও গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণে প্রথমে ট্রাজেডি সৃষ্টি করতে শুরু করে— 'of the ancient dramatists the Greeks alone are of any importance. In this branch of art the Romans were at first mere translators of the Greeks and afterwards imitators'.

ফরাসী নাট্য সাহিত্যের ধারা প্রধানতঃ তিনটি Unity-কে অবলম্বন করে প্রবাহিত— Unity of place (স্থান-ঐক্য) Unity of action (কার্য-ঐক্য), Unity of time (কাল ঐক্য)। দ্বিতীয় হেনরির সামনে জোডেলি (Jodelle) প্রথমে একখানি পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক লিখে অভিনীত করেন। তারপরে কর্ণেলি, মলিয়ার, রেমিনি, ভলতেয়ার প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত নাট্য-কারগণ নাটক সৃষ্টি করে ফরাসী সাহিত্যের নাট্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। জার্মানীতে

Lessing, Goethe, Schiller প্রভৃতি নাট্যকার প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইংলন্ডে Shakespeare-এর আগে প্রধানতঃ দু' ধরণের নাটক রচনা হচ্ছিল— Mysteries and Miracles (নিগূঢ় বিষয় অথবা অলৌকিক ঘটনামূলক) অথবা Moralities (নীতিগর্ভ উপদেশমূলক) ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে রচিত Nicolas Udall-এর Ralf Roister Doister ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম নাটক। এর দশবছর পরে গর্বুদক (Gorbudoc) নামে প্রথম tragedy লেখেন Norton এবং Lord Bucherest সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার Marlowe এই রীতিকে অনুসরণ করেছেন নাট্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে। Shakespeare এর নাটকে কাব্যের প্রকাশ বাহুল্যের জন্যে Tolstoy বলেছেন যে Shakespeare ভাল নাটক রচনা করতে পারেন নি। Abercrombie-র লেখা 'Poetry in Drama' প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন যে মাত্রাবোধই নাট্যকারের প্রতিভা-বিচারের প্রথম মানদন্ড— এবং একথা সত্য যে এই মাত্রাবোধে T. S. Eliot অনেকটা অজ্ঞ ছিলেন। এই মাত্রাবোধের অভাবে অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠা কবি ও প্রথিতযশা ঔপন্যাসিকও কবিতা লিখতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কবিত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ আমরা দেখি এবং কবিত্বের এই সৌন্দর্যময় প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বর্ণনা প্রণালীকে যেন আরো অধিক সৌন্দর্য মন্ডিত করেছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে স্থানে স্থানে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে অতিক্রম করে যাওয়ায় নাটকীয় গতিই যে শুধু বাধা পেয়েছে তা' নয়, অনেক ক্ষেত্রে নাটকীয় রসসৃষ্টিকেও ব্যাহত করেছে যদিও Aristotle এই বস্তুটির মধ্যেই Higher Art'-এর সন্ধান পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকে বিশেষতঃ রাজা ও রাণী নাটকে action এবং poetic feeling এর সুন্দর সংমিশ্রণের অভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এখানে action গৌণ হয়ে গেছে— Drama is life presented in action— পাশ্চাত্য বিশ্বজনের এই উক্তির অনেকটুকুই যেন সার্থকতা লাভ করেনি— এখানে poetie feeling বা কবি-চেতনাই মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। অবশ্য সাংকেতিক নাটকে এই বিচার কখনই প্রযোজ্য নয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক প্রতিথযশা নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন— নাটকের উৎপত্তি প্রসঙ্গে সে কথার আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলাদেশে 'ললিত মাধব' 'বিদগ্ধ মাধব' প্রভৃতি নাটক এবং চৈতন্য-জীবনীকে অবলম্বন করে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি নাটক লেখা হলেও, নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তা নিতান্তই অল্প। ভারতীয় আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শে অনু-প্রাণিত হয়ে এই উভয় নাট্য-রচনা রীতিকে এক করে প্রথম সার্থক নাটক ঊনিশ শতকে গিরীশচন্দ্র সৃষ্টি করেন। সমসময়ের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য-কুশলীত্রয় দ্বিজেন্দ্রলাল—ক্ষীরোদ প্রসাদ—রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির প্রচেষ্টায় এমন কি ঊনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের অনুপ্রেরণা ও নাট্য সৃষ্টির ব্যাপারে বাংলা নাট্যসাহিত্য বিশ্বের অপর যে কোনো দেশের চেয়ে, এক শতাব্দীর ঘটনায় বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছে।

নাটকের ক্রমবিকাশের ধারায় যথাযথ আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি— তার ক্রমবিকাশের বিস্তারিত আলোচনা না করলেও চলে। আধুনিক উপন্যা-সের উপাদান মধ্যযুগীয় ইংরেজি সাহিত্যে Chaucer এর হাতে এবং 'আমাদের প্রাচীন কাব্য সাহিত্যে, উপাখ্যান আখ্যায়িকায় এরূপ অনেক বাস্তব-রস-প্রধান খন্ডাংশ আছে' (বাংলা সাহিত্যের কথা ঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) যে, আমরা সেগুলিকে আধুনিক উপন্যাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। প্রসার-শীলতার লক্ষণহীন লেখক Richardson ইংরেজি উপ-ন্যাসের আবিষ্কর্তা, তার পরে প্রাণখোলা হাসি ও স্নিগ্ধ উদার মনোভাবসম্পন্ন রসিক লেখক

ফিল্ডিংস-এ রিচার্ডসনের উত্তর সাধক জেন অস্টেনের উপন্যাসের পারিবারিক চিত্র পরিস্ফুটনে, মধ্যযুগীয় বীর রসাত্মক উপন্যাস-রচয়িতা স্কটের রচনায় ঊনিশ শতকের হার্ডি ও হথর্নের বাস্তব মুখিতার সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণে উপন্যাস সৃষ্টিতে, বিশেষতঃ Hardy-র 'Far From the Madding Crowd' এবং 'Under the Green wood tree' নামে উপন্যাস দুটিতে ইংরেজি উপন্যাস সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখা যায়। রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে টলষ্টয় (War and Peace-এর লেখক) এবং Groky-র (Mother গ্রন্থের লেখক) নাম প্রসিদ্ধ।

বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মর্যাদায় অনেকেই ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁসকে প্রতিষ্ঠিত করেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, Hardy-র পরে ইংরেজি সাহিত্যে এক খানিও ভালো উপন্যাস রচিত হয়নি। আধুনিক যুগের স্টেজ-এর চাহিদা মতো বিরাট আয়তনের নাটক রচনা যেমন অসম্ভব, ঠিক একই কারণে গতির যুগে আধুনিক মানবমন সুদীর্ঘ উপন্যাসের রস গ্রহণে অনিচ্ছুক। সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যের বাজার এখন মন্দা। বাংলা সাহিত্যে ঊনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক অথবা সামাজিক উপাদান সংগ্রহ করে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন।। এবং সেই সব উপন্যাসে বঙ্কিমের কবিত্বশক্তি 'হিউমার' সৃষ্টির ক্ষমতা প্রভৃতি সকলের প্রিয় করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামাজিক রচনা 'স্বর্ণলতার' নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ 'একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য রাশি, অপর দিকে ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য একত্র সমাহৃত করিয়া নিজের প্রতিভার অপূর্ব ছাঁচে ফেলিয়া যে ললিত-ললামশালিনী তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে' (রবি রশ্মি। ২ খণ্ড। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)— তাঁর সমসাময়িক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র 'অন্নদাদিদির সর্বংসহামূর্তিকে, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর নীরব অন্তঃশীল প্রেমকে, অভয়ার বিদ্রোহের প্রতিমূর্তিকে' শ্রদ্ধা জানিয়ে 'ত্যাগের মহিমায় ও আন্তরিক আকুলতায় যে প্রেম সত্যকারের প্রেমের স্তরে উপনীত হইয়াছে সামাজিক বা অসামাজিক সেই প্রেমের নিকটেই তিনি শ্রদ্ধায় ও সম্মানে মস্তক অবনত করিয়া' (বাংলা সাহিত্যের আলোচনা ঃ মদন মোহন কুমার) সার্থক কথা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কুশলী কথা শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বনফুল, আশাপূর্ণা দেবী, নিরুপমা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ইত্যাদি।

এইবারে সংক্ষেপে উপন্যাস ও নাটকের বিচারপদ্ধতি বিশ্লেষণ করা যাক। উভয় প্রকার সাহিত্যই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের আশা-আকাংখার বাণীরূপ, একথা আমরা স্বীকার করি। উপন্যাসের মধ্যে নাট্যধর্ম কোনো কোনো সময় ফুটে ওঠে যেমন মৃণালিনী, সীতারাম, দেবদাস, বিষাদসিন্ধু ইত্যাদি আবার নাটকের মধ্যেও কোন কোন সময়ে উপন্যাস-ধর্ম দেখা যায় যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' নাটকে।

কিন্তু এমন কোনো ধারণা করা উচিত নয় যে, ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে যাওয়ার মতো উপন্যাসের মধ্যে নাট্য-উপস্থাপনা-রীতির কৌশল কিংবা নাটকের মধ্যে উপন্যাস-সৃষ্টি পদ্ধতি খুঁজতে যাওয়া ব্যর্থতার নামান্তর মাত্র। এবং নাটক ও উপন্যাস বিচার বিশ্লেষণ করার সময়ে দুটি পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। উপন্যাসের বিচার প্রসঙ্গে Georges Politzer 'An Elementary Course in Philosophy' বইটিতে কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়েছেন, যেগুলিকে আমরা

'Method of Directical Analysis' বলে মনে করতে পারি —

(১) Primary attention must be paid to the 'content' of the book or the story. That is to be analysed. Examine it independently of all social questions, for everything does not originate in the class struggle, and in economic conditions—

এই উক্তিটি নাটক ও উপন্যাস উভয়ের বিচার পদ্ধতিতে সমভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত কিন্তু ইদানীং কালে এই উক্তিটি অনেক সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

(২) Next observe the social types which are the leading figures in the plot. Find what class they belong to, examine the actions of the characters and see if in any way, what happens in the novel can be linked up with a social point of view.

নাটক ও উপন্যাস সম্পর্কে এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য হলেও, একে অনেকখানি একদেশদর্শী বলে মনে হয়। 'Social point of view' এ সাহিত্যে প্রকাশিত ঘটনার বিচার করলে দেখা যাবে যে যুগোপযোগী নাটক ও উপন্যাস অনেক ক্ষেত্রে (বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ও বার্নাড শ'য়ের বহু নাটকে) যুগের চাহিদা মিটাতে পারলেও যুগকে অতিক্রম করতে পারে না এবং এর ফলে অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যও পরবর্তীকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শরৎচন্দ্র ও Galsworthy সম্পর্কে এ উক্তি ও মত কেউ কেউ পোষণ করেন।

নাটক বিচার করার সময়ে আর একটি কথা স্বীকার করতে হবে;— নাটকের দুটি লক্ষণ— ১।Tragedy ২। Comedy Tragedy দু'ধরণের—একটিতে Pathos এর দ্বারা Tragic রসকে নাটকের মধ্যে সুসংহতভাবে পরিবেশিত করা হয় কিন্তু অন্যটিতে এই Pathos-এর অভাবে Tragedy ব্যর্থ হয় এবং Pity-র সৃষ্টি করে 'সহৃদয় হৃদয়' সম্পন্ন পাঠকের কাছে।—

অধ্যাপক নিকলের এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, 'Tragedy after all, is not a thing of tears : Pathos stands upon a lower plane of dramatic art : pathos is closely connected with pity and neither is generally indulged in by the great dramatist as the main tragic motif' এবং এই বিচারে ইউরিপিডিস অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি লেখক, কেন না 'Pathos is one of Euripide's main devices! সুতরাং, Tragedy, then, we may say, has for its aim not the arousing of pity but the conjuring up of a feeling of awe allied to lofty grandeur' (Nicholl—Theory of Drama) ট্র্যাজেডির স্থায়ীভাবে শোচনা (পিটি) নয়। স্থায়িভাব বিস্ময়, উদাত্ত মহিমা। আবার কমেডিতে জীবনের অন্য আর এক দিকে রূপায়ন হয়। সুতরাং নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার করতে হলে ট্র্যাজেডি ও কমেডির সংজ্ঞা নিরূপণ করে, এই দুই বিষয়ে নাটকে কতোখানি ট্র্যাজেডি ও কমেডির সংজ্ঞা যথার্থভাবে আরোপিত হয়েছে তার আলোচনা অপরিহার্য— কিন্তু উপন্যাস বিচারে এমন কোনো নিয়ম নেই। তা ছাড়া নাটকের প্লটাসিস (আখ্যানের প্রারম্ভ ভাগ) ইপিলাটিস (বিরুদ্ধগতি), কেটাসটাটিস (পুষ্টি) পেরিপ্যাটাসিয়া (বিরাম) ও কেটাসট্রোফ (উপসংহৃতি) ইত্যাদি কতোদূর সার্থকতা লাভ করে তা বিচার্য, কিন্তু উপন্যাসের উপক্রমণিকা হতে উপসংহার পর্যন্ত পরিণামমুখী কাহিনীর বিচার, এই নিয়মের বশবর্তী নয়।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়েটি হেসে মৃগনয়নীর কাছে এসে কমলের দিকে তাকিয়ে বলে,— পরে কেন কমল। আমি মাসীমার কাছে বসে বসে সব বলব। তুমি তোমার কাজে যাও। শোন। আমাদের বাড়ী গিয়ে আমার কাপড়-চোপড়গুলো একটা ট্যাক্সি করে নিয়ে এসো। কমল একটু হাসে।— আমার যাওয়া কি ঠিক হবে! আচ্ছা আমি গিয়ে অজয়কে পাঠাচ্ছি। ওকে টিকটিকিগুলো চিনতে পারবে না।

কমল বেড়িয়ে যাবার আগে মাকে বলে।— অমল এলে ওকে বাজারে পাঠিয়ে একটু মাছ আনিও মা। বলে কাবেরীর দিকে তাকিয়ে বলে।— ও আবার মাছ ছাড়া খেতে পারে না। কাবেরী ধমকে ওঠে।— যাও বাজে বোক না। না মাসীমা এবেলা আর মাছের দরকার নেই। অমনি একটু তরকারী ভাত রাঁধলেই হবে। মৃগনয়নী তাকিয়ে থাকে কাবেরীর দিকে। কি সুন্দর মেয়ে। কেমন পরিষ্কার কথাবার্তা। কমলকে কথায় কথায় ধমকাচ্ছে। এটা কিন্তু ভারী ভাল লাগছে মৃগনয়নীর।

—এসো মা। আমরা নীচে রান্নাঘরে গিয়ে কথা বলি।

কাবেরীকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে এসে ওকে একখানা পিঁড়ি পেতে দেয়।

—বোস।

কাবেরী বসে।

—মেয়েরাও কি আজকাল এ কাজ করছে?

—আর আর করবে না কেন মাসীমা। দেশ কি শুধু ছেলেদের? মেয়েদের নয়?

মৃগনয়নী ও দীপ্ত চোখের ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হাসে।— তা বটে। তোমাদের দেশ কোথায়?

—কেষ্ট নগর। এখন কলকাতাতেই থাকি আমরা। আমরা দু বোন। এক ভাই।

—ছোট বোনের বয়েস কত?

—ওর এখন কুড়ি হবে। গেল বছর বিয়ে হয়েছে। ভাইটি খুব ছোট।

—তুমি বিয়ে— ?

কাবেরীর মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে যায়।— হাসবার চেষ্টা করে বলে,— আমি এই কাজই করি। পড়ছিও। এবার আই, এ. দোব।

—খোকার সঙ্গে পড় বুঝি?

—না। মেয়েদের কলেজে?

—বাবা কি করেন?

—বাবা গভর্ণমেন্টে কাজ করেন। চাকরী ভালই করেন। অফিসার। কলকাতাতে বাড়ী করেছেন। আর বছর দুই পরে রিটায়ার করবেন। আমাকে নিয়ে বারার হয়েছে জ্বালা।

—কেন?—

কাবেরী খুব খানিকটে হেসে নেয়।— আমার জন্যে তার চাকরী যায় যায়।

—আহা, যদি চাকরী যায়!

—যায় ত' যাবে।

মৃগনয়নী উনুনে আগুন দিয়ে বাইরে এসে বসে। কাবেরীও বাইরে আসে।

—খোকার সঙ্গে তোমার আলাপ কি করে হোল?

—ওই দলেই। ওখানে ওকে সবাই খুব মানে। আমি বাদে—।

বলেই আবার খিল খিল করে হেসে ওঠে কাবেরী। বলে,— আমার সঙ্গে কমল পেরে ওঠে না। মুখ গোমড়া করে থাকলে দু ধমকে হাসিয়ে দিই। ওকে কিন্তু আর সবাই খুব ভয় করে। খুব গম্ভীর কিনা? এত কম কথা বলে কেন মাসীমা? মৃগনয়নী হেসে ফেলে,— ছোট-বেলা থেকেই ওইরকম।

—আমার বাবাও ওর সঙ্গে কথা বলতে একটু ইয়ে করে।

—তোমাদের বাড়ী বুঝি ও যায়?

—হ্যাঁ। অনেক দিন থেকে। বাবা ওকে একদম পছন্দ করেন না। মুখে কিছু বলেন না। মা খুব ভালবাসেন। একটু ভাল রান্না হলেই মা আমায় বলবেন— কমলকে আজ ডেকে নিয়ে আসিস। আচ্ছা, আমি ওকে কোথায় খুঁজি বলুন ত' মাসীমা।

ওযে কোথায় কখন ঘোরাফেরা করে দলের কেউও ত' জানে না। ঘুরে ঘুরে ওকে বার করতে হয়। হয়ত দেখি এক বস্তি থেকে আমাদের বাড়ীর দিকেই আসছে। পাকড়াও হয়ে যায়। বলে, কাজ আছে এখন যেতে পারব না। মা ভাববে বাড়ীতে। তবু ওকে ছাড়া চলবে না। আমার মায়ের মন খারাপ হয়ে যাবে। অগত্যা ওকে আসতে হয়। মৃগনয়নীর বেশ লাগছে কথাগুলো। বলে,— তবে ও ছেলে পড়ায় কখন?

—ছেলে পড়ায় নাকি?— যেন আকাশ থেকে পড়ে কাবেরী।

মৃগনয়নী হেসে বলে,— দুটো ছেলে পড়ায়। তা নইলে আর সংসার চলে কি করে?

—তাই নাকি! দেখেছেন, আমাকেও বলেনি। কেউ জানে না কখন ছেলে পড়ায়। জানে আমায় বললে —!

—তোমায় বললে কি?

—কি আর! আমায় বললে আমি কি ছেলে পড়াতে দিতুম। বলুন ত' ওই শরীর। কলেজে পড়ে পার্টির কাজ করে আবার ছেলে পড়ান। এত নিজে ইচ্ছে করে মরা! কদিন আর বাঁচবে?

—কিন্তু সংসার কি করে চলবে মা?

—চলবে। ও আমায় পড়াক না! — কাবেরী যেন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।— বাবা ত' আমায় মাসে দশ টাকা করে দেন। সেটা ওর কোন কাজে লাগলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হোত! কি মাসীমা?

মৃগনয়নী ওর সরল মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—না মাসীমা। আপনি বারণ করে দেবেন। এমন করে নিজে মরে লাভ আছে?

মৃগনয়নীর বুকটা ভরে ওঠে কাবেরীর অন্তরের মাপ দেখতে পেয়ে।

—দাঁড়াও আসুক। কোন কথা কাউকে বলবে না! কি ছেলেরে বাবা! কি ছেলেই পেটে ধরেছিলেন বাসীমা আমাদেরও জ্বালিয়ে মারলো! মৃগনয়নী কথা না বলে রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে ভাত চড়িয়ে দেয়। অমলও এখনও এলোনা। ওদের জন্যে একটু মাছ আনাতে পারলে ভাল হোত। কাকে দিয়ে যে আনাবে? অমল আজকাল ফিরতে বড় রাত করে। কেউ কিছু বলেও না। মৃগনয়নী নীরব। কমলও। অমল এ সুযোগে দিনের পর দিন কি যে হচ্ছে। মুখখানা রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। চেহারাটা পাকিয়ে গেছে। দেখলেই মনে হয়, অনেক অত্যাচার করছে ও দিনেরাতে। সন্দেহ হয় মৃগনয়নীর মাঝে মাঝে অমল বোধহয় নেশা করেও আসে। মৃগনয়নী

বলে আর কি করবে। মাকে গ্রাহ্যই করে না অমল। যাকে ভয় করত, সে নেই। অমলের এখন ভয় ভীত কিছুই নেই। কমল ত ওর সঙ্গে প্রায় কথাই বলে না। অমলও বেঁচে যায়। নিজের খুসীতে দিনরাত কাটাচ্ছে। এখনও অমল এলো না। ও নিশ্চয়ই অনেক রাত্রে ফিরবে। অগত্যা মৃগনয়নী তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে বসে তরকারী কুটতে। রাত হয়ে আসছে ক্রমে। কমলির মা একবার আসে। প্রায় রোজই আসে। কাবেরীর দিকে চোখ পড়তে বলে,— ইটি কে গা?

—এটি আমার বোন ঝি। কাবেরী। একটু হেসে বলে মৃগনয়নী।

—তোমার জ্বর দেখবার কাঠিটা একবার দেবে দিদি। ডাক্তার এয়েছে। কমলির জ্বর দেখবে।

মৃগনয়নী উঠে ওপর থেকে থার্মোমিটারটা এনে কমলির মায়ের হাতে দেয়। ফিক ফিক করে হাসে কাবেরী।

—হাসছো কেন?

—জ্বর দেখবার কাঠি!— বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে কাবেরী।

এর ভেতর কমল বাড়ী ঢোকে। কাবেরীকে অমল লুটিয়ে পড়ে হাসতে দেখে বলে,— কি হোল! একটু যেন বিরক্তও হয়। কাবেরী বলে,— দেখো অমল চোখ পাকিয়ে তাকিও না। হাসতে দেখলে কমল এমন বিচ্ছিরী তাকায়। জানেন মাসীমা! নিজে ত' দিন রাত্তির গা ফুলিয়েই আছে। জ্বর দেখবার কাঠি।— বলে আবার খিল খিল করে হেসে ওঠে কাবেরী। কমল মায়ের কাছে গিয়ে বলে,— অমল এসেছিল মা? বাজারে পাঠিয়েছিলে?

—না। অমল এখনও আসেনি ত'?

—এখনও আসেনি?

—না। মাঝে মাঝেই আজকাল রাত করে বাবা!

—হুঁ।— গম্ভীর হয়ে যায় আরও। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে,— তাহলে আমি যাই।

কাবেরী বলে,— মাছ আনলে কিন্তু ফেলা যাবে! আমি খাব না। মৃগনয়নী বলে,—থাক। আজ না হয় থাক। কাল আনিস। কমল কাবেরীর দিকে তাকিয়ে বলে,— তোমার সাড়ীর স্যুট-কেশ অজয় কাল ভোরে নিয়ে আসবে। সন্ধ্যেবেলা না যাওয়াই ভাল। ওদের কড়া নজর তোমাদের বাড়ীর দিকে।

—বা, বা, আজ আমি কি পরব?

—আমার একখানা কাপড় পরো। মাকে বল।

বলে কমল ওপরে উঠে যায়। কাবেরী উঠে পড়ে।— দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! বলে পেছনে পেছনে ওপর চলে যায়। মৃগনয়নী তরকারী কুটতে কুটতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। মনটা ওর বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠছে। ভেতরের প্রসন্নতাও যেন আরও স্থিত হয়েছে। নীরবে তরকারী কুটে শেষ করে ওপরে ওঠে মৃগনয়নী। মেয়েটিকে একখানা সাড়ী বার করে দিতে হবে। তার নিজের খান তিনেক সাড়ী এখনও রয়েছে বাক্সে। তাই থেকেই বার করে দেবে। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে জানলার সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর। একি! এমন মুখ ত' ওর দেখেনি মৃগনয়নী। মৃগনয়নী গম্ভীর সুরে বলছে কমলকে—সমীর কি আজ রাত্রে বহরমপুর যাবে? কমলের ভীত গলা শোনা যায়।— ও বলছিলো—। মেয়েটির বিরক্ত সুগম্ভীর গলা,— ও বললে ত' হবে না। আমি যা বলব তাই হবে। চিঠিটা নিয়ে বহরম-পুর আজ ওকে যেতেই হবে। আদেশ। কঠোর আদেশ। কমল মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

—যাও। সমীরকে বলে এসো। আজ সে না গেলে ওখানে কাল বিকেলে সব ধরা পড়ে যাবে। সমীরকে আমার কথা শুনতে হবে। না শুনলে তার কি হবে তাকে ভাবতে বোল।

মৃগনয়নী কেঁপে ওঠে। একি কণ্ঠস্বর মেয়েটির! এক মুহূর্ত আগে কি এই মেয়েই এত হেসেছে এত কথা বলছে! কেমন কেমন লাগে মৃগনয়নীর।

—যাও এখুনী।

হঠাৎ মৃগনয়নীর দিকে মেয়েটির চোখ পড়ে জানলা দিয়ে। মুহূর্তে মুখে হাসি এসে বলে মেয়েটি,— আচ্ছা কমল, তুমি নাকি ছেলে পড়াও? মাসীমা বললে! বাবব! কি ছেলে, আমাকে কিচ্ছু বলো নি? কমলকে একটু যেন ইসারাও করে। কমল বাইরে বেরিয়ে আসে। মেয়েটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে—বাবব! বলেছি বলে আবার রাগ! কি ছেলে আপনার মাসীমা ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠিনে। কমল বেরিয়ে যায়। মৃগনয়নী নীরবে এসে বাক্স থেকে একখানা সাড়ী বার করে কাবেরীকে দেয়।

—কাপড় বদলে নীচে এসো।— বলে নীচে নেমে আসে মৃগনয়নী।

কি বিচিত্র সংসার! অবাক হয়ে মনে মনে হাসে ও, মেয়েটির চাতুরীটুকুও ওর যে খুব খারাপ লাগে তা নয়। মৃগনয়নীর কাছে মেয়েটি আরও দীপ্তিময়ী হয়ে ওঠে। ওর অসাধারণ চাতুর্য মৃগনয়নীকে মুগ্ধ করে। তবু এই মুগ্ধতা এই ভাল লাগা, মেয়েটি সবই ওর কাছে আলগা আলগা। মনে ওর বসে না এসব। মনটা ছুঁয়ে যেতে পারে মাত্র। বিঁধে যায় না। এমনি একটা অবস্থা ভেতরে ভেতরে করে নিয়েছে মৃগনয়নী। ও যেখানে স্থির, ওর যেখানে আনন্দ সেটার জন্ম বাইরে নয়, এটা স্পষ্টই ধরা পড়ে গেছে ওর কাছে। তাই যেখানে এর জন্ম সেখানেই ও তাকিয়ে থাকে বেশী। অনেকক্ষণ। প্রায় সর্বক্ষণ। এর ভেতরে অমল বাড়ী ঢোকে। মৃগনয়নী তরকারী তুলে দেয় উনুনে।

তাকায় অমলের দিকে।— এত রাত হোল কেনরে?

—এমনি!— বলে শিস দিতে দিতে অমল রান্নাঘরের সামনে আসে।

বলে,— আমায় গোটা দশেক টাকা দিতে পারো মা। বড্ড দরকার।

—টাকা! টাকা কি করবি?

—কাজ আছে।

—কি কাজ শুনি?

সিঁড়ির সামনে থেকে কাবেরীর গলা শোনা যায়।— কাজ আর কি মাসীমা। বায়স্কোপ টায়স্কোপ যাবে। শোন। আমি তোমায় দুটো টাকা দোব। বায়স্কোপ দেখে এসো কেমন?

অমল হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কাবেরীর দিকে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে।— ইনি কে মা?

—তোমার দিদি হয়।

অমল তাকায় কাবেরীর দিকে। লাল পেড়ে সাদা শাড়ীটা পরে অপরূপ দেখাচ্ছে কাবেরীকে। ওর তাকানীটা খুব ভাল নয় বুঝতে পারে কাবেরী। বলে,— ইদিকে শোন। অমল কাছে আসে। ওর হাতটা ধরে বলে।— চল, ওপরে গিয়ে আমরা গল্প করি। অমলকে টানতে টানতে ওপরে যায়। মৃগনয়নী রাঁধতে থাকে আর ভাবে। অসংলগ্ন ভাবনা আলগা ভাবনা। মনটা ওর স্থিত হয়ে অন্য জায়গায়। অন্য কোনখানে।

সাতাশ

পরদিন সন্ধ্যার পর মেয়েটি বেরিয়েছিল। বেরোবার সময় মুখে কি সব মাখলে। কাজল পড়লো খুব মোটা করে। ঘোমটা দিল খানিকটা। বেরোল। কোথায় বেরোল কে জানে। জানতে

চায়ও না মৃগনয়নী। কমল বসে ছিল আজ বাড়ীতে। মৃগনয়নী ডালের বড়া ভাজছিল। কমল এসে বসল,— মা একটা ডালের বড়া দাও খাই। মৃগনয়নী হেসে একখানা ডিসে করে দুখানা বড়া তুলে দিলে ওর হাতে। কমল বড়া কামড়াতে কামড়াতে বললে।— মেয়েটিকে কেমন মনে হচ্ছে মা?

—ভাল।

—ওর আসল নাম জান?

—না ত'?

—মণিমালা সরকার।

—ওর মা বুঝি তোকে খুব ভালবাসে?

—হ্যাঁ। তা বাসে। কেন, বলছিল বুঝি?

—হ্যাঁ। বলছিল তুইই নাকি ওদের দলের কর্তা?

কমলের মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে, বলে,— বলছিল বুঝি। বাজে কথা। সত্যি কথাটা বলেনি। সত্যি কথা আমাদের প্রায় বলতেই নেই। মৃগনয়নী গম্ভীর মুখে বলে,— যেখানে সত্যি নেই, সেখানে দল ত' টেঁকে না বাবা। কথাটা বোধহয় নিষ্ঠুর সত্য।

কমলও মুখটা গম্ভীর করে বসে থাকে। মুখখানা ম্লান হয়ে যায়।

বলে,— কথাটা বোধহয় ঠিকই বলেছ। আমারও যেন আর এত লুকোচুরি এত মিথ্যে ভাল লাগে না।

—তবে না গেলেই পারিস।

একটু সময় চুপ করে থেকে বলে কমল।— ফেরবার ত' আর উপায় নেই মা। মৃগনয়নীর হাত বন্ধ হয়ে যায়। বড়াগুলো আর নাড়তে পারে না। পুড়ে ওঠে। কমলই বলে,— ওগুলো পুড়ে গেল। নামাও। কড়াটা অবশ হাতে নামায় মৃগনয়নী।

কমল আস্তে আস্তে বলে,— কি জান। ওই মণিমালাই সব। ওর কথায় দলের সবাইকে চলতে হয়। ও আছে আর একটি ভদ্রলোক আছে। সে এক দাদা। একে আমরা মণিদি বলে ডাকি। এই দিদি দাদাকে মানতেই মানতেই যেন দম ফুরিয়ে যায় মা। কি যে শক্তি এই মণিদির তুমি জান না। সাপুড়ের বশ করে সাপের মত ছোবল মারে। সে বিষ নামাবার মত রোজা আর খুঁজে পাবে না।

—এমন করে দেশের কি ভাল হবে বাবা।

—তাই ত' আজকাল আমাদের কয়েকজনকে ভাবিয়ে তুলেছে।

তবে স্পষ্ট বললেই ত' পারিস।

—বললাম ত' মণিদিকে জান না। ও অত হাসে কিন্তু কাঁদতে পারে তার চেয়ে বেশী। দেখতে কেমন নরম, ভেতরটা পাথর। মৃগনয়নী চুপ করে কি ভাবে, তারপর বলে,— বিয়ে করেনি কেন?

—বিয়ে করেছিল।

—করেছিল! তবে শাঁখা সিঁদুর নেই যে'

—শাঁখা ভেঙেছে। সিঁদুর মুছেছে।

—কে?

—ওর মা।

—কেন?

—ওর বিয়ে হয়েছিল এক জমিদার বাড়ীর ছেলের সঙ্গে। তখন মণি-দি খুব ছোট। শ্বশুরবাড়ী থেকে প্রথমবার যখন ফিরে এল সঙ্গে যে ঝি গিয়েছিল সে বললে, ওর সতীন আছে ওখানে একটি। শুনে ওর মা খেপে গেল। বাপও।

—তাঁরা জানত না?

—না। লুকিয়ে বিয়ে করেছিল। তারপর দিন দশেক পরে যখন ওর স্বামী এলো। তার সামনে মেয়ের শাঁখা ভাঙলে, সিঁদুর মুছাল। বললে। আমার মেয়ের বিয়ে হয়নি। আর ওর স্বামীকে দুদিন বাড়ীর থামের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। মেরেছিল।

—কে?

—ওর বাবা। মস্ত গবর্ণমেণ্টের চাকুরে ত'। কে আর কি বলবে।

—ছি, ছি, এত তেজ!

—ওদের ভয়ানক তেজ। ওইটের জন্যেই ত' আজ মণিদির এত প্রতিপত্তি দলে।

—এত তেজ ভাল নয় বাবা। দেশিস ভাল হবে না। হতে পারে না।

কমল হাসে।— আজকে আর তোমার কথা কে মানছে বলো। এই তেজকেই ত' পূজো করছে সবাই। সবাই বলে, ওর স্বামীকে মেরে ভাল করেছে, শাঁখা ভেঙে ভাল করেছে।—সবাই কে?

—এই ধরো সবাই। আমাদের বন্ধু বান্ধব, দলের আর সবাই। মণিদির প্রশংসায় গলে পড়ে। হাসে মৃগনয়নী।— ছেলে মানুষ কিনা! শুধু ভাঙাটাই ভাল বলে। তোর কি মনে হয়।

—আমিও খুব ভক্তি করতাম,— কিন্তু—।

—কিন্তু কি?

—কিন্তু তোমার সঙ্গে যখনই তুলনা করেছি। মণিদি যেন অনেক ছোট হয়ে গেছে। অথচ তুমি ত' জোরে একটা কথা বলতেও পার না। ও সহ্য যা করেছে তার চেয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে বেশী। আর তুমি—? মুখ বুজে কি করে সহ্য কর মা? কমলের গলাটা কাঁপছে। মৃগনয়নী ভেতরের তারগুলো বহুদিন পর ঝংকার তোলে।— আমার কথা ছেড়ে দে। কমল ত' এত কথা কখনও বলে না। আজ ও মায়ের কাছে সব উজার করে দিচ্ছে।

—আমার মন বলছে আর বেশীদিন নয় মা? ওদের এই মিথ্যে দল ভাঙবে। এমনিতেই ভাঙন ধরে গেছে। ভেতর ভেতর গুমট হাওয়া চলছে। খবর সব পৌঁছে যাচ্ছে পুলিশের কাছে। মণিদি ত' দিন তিনেক আগেই ধরা পড়ে যেত। বরাতে বেঁচে গেছে। আর বেশীদিন লুকিয়ে থাকা চলবে না।

অমলের গলা শোনা যায়।

—কাবেরীদি কোথায় মা?

—বাড়ী নেই। কেন?

—না, বেড়াতে বেরোতুম। বলছিল কিনা, আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরুবে। একা একা বেরুতে পারে না। কমল হাসে। অমল বলে,—হাসছ যে! আমার কি ডাট জান এ লাইনে। আপটু সিমলে যে কোন মিঞাকে বিট দিয়ে দিতে পারি।

—তোর কথাগুলো এমন বিচ্ছিরি হয়েছে কেনরে?— জিজ্ঞেস করে কমল। অমল বলে,— বিচ্ছিরি কোথায়! পাড়ায় ত' সবাই বলে এই কথা। বেমক্কা কথা ত' কিছু বলিনি!

—যা ওপরে যা। বাজে বকিসনি।

অমল ওপরে চলে যায়।

—অমলটা একেবারে গোল্লায় গেছে মা।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। কমলও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে যায়।

একটু বেশী রাতে ফেরে কাবেরী। মুখটা গম্ভীর। চেষ্টা করে হেসে মৃগনয়নীর সঙ্গে দু একটা কথা বলতে চায়। কিন্তু মৃগনয়নী যেন অটল। কথাগুলো সব মেপে বেরোয় ওর মুখ দিয়ে। খাওয়া সেরে কমল শুয়ে পড়ে। অমল কাবেরীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে।

—দাদাকে যেন বোল না।— একটা বিঁড়ি ধরায় অমল।

কাবেরী খুব হাসে।— খুব বিঁড়ি খাও বুঝি?

—কি খাই না! এ শম্মাকে কোন নেশা বিট্ দিতে পারবে না।

—সত্যি! —

—হাসলে কিন্তু —।

—কি?

—তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায় কাবেরী দি'!

কাবেরী খিল খিল করে হাসতে থাকে। এমন মজার কথা যেন ও জীবনে শোনেনি।

মৃগনয়নী খেয়ে ওপরে আসে। মৃগনয়নীর পাশে এসে কাবেরী শুয়ে পড়ে। অমলও শুয়ে পরে। মৃগনয়নী বসে থাকে অনেকক্ষণ। একটু পরে কাবেরী মাদুরটা নিয়ে বারান্দায় শুতে যায়। কি গরম! দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটুও হাওয়া নেই। রাত ক্রমে বাড়ে। মৃগনয়নী আঁচলখানা পেতে কাত হয়ে শোয়। অমলের আর আজ ঘুম হয় না। বার বার ঘাড় উঠিয়ে বারান্দার দিকে তাকায়। রাত আরও বাড়ে। অমল পা টিপে টিপে ওঠে। তাকায় কমলের দিকে। কমল খুব ঘুমোচ্ছে। মা- ও যেন ঘুম ঘুম। একটু গলার শব্দ করে। কেউ ত' জাগে না। ও ওঠে। উঠে বারান্দায় যায় পা টপে টিপে। কাবেরী শুয়ে আছে। পিঠের আঁচল নেই। ধবধবে সাদা পিঠ। অমলের চোখ-দুটো জ্বলতে থাকে। ওর পায়ের ওপর একখানা হাত রাখে। নরম সুডোল পাদুটি। আস্তে আস্তে শাড়ীর প্রান্ত হাঁটুর ওপরে উঠতে থাকে। অকস্মাৎ অমল অনুভব করে ওর হাতের কব্জিটা কাবেরীদির নরম মুঠোয়। কাবেরীদির মুঠোটা ক্রমে শক্ত হতে থাকে। আরও শক্ত। ওরে ওরে বাবা। এত শক্ত! অমলের কব্জি থেকে সমস্ত হাতটা মচকে যাচ্ছে। উঃ! অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে অমলের। ওরে বাবা! হাতটা একেবারে মচড়ে দিলে! কি কঠিন লোহার মত মুঠো কাবেরীদির! আস্তে আস্তে কাবেরীর মুঠো আলগা হয়। তেমনি ঘুমোতে থাকে কাবেরী। অমলের হাতখানা বোধহয় ভেঙেই গেছে। যন্ত্রণায় ওর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। চুপ করে আস্তে আস্তে ঘরে এসে শুয়ে পড়ে অমল। শুলে কি হবে। ঘুম হয় না। যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়তে থাকে। কব্জিটাও ফুলে ওঠে। পরদিন সকালে উঠে দেখে হাতটা বেশ ফুলে গেছে। কাউকে কিছু না বলে ও জামাটা পরে আস্তে আস্তে নীচে নামে। দেখে কাবেরীদি দাঁত মাজছে।

ওমা তোমার হাতে কি হল অমল? হাতখানা যে ফুলে গেছে। মুচকে মুচকে হাসছে কাবেরীদি। অমলের কানদুটো লাল হয়ে গরম লাগে। মুখটা নীচু হয়ে যায়। মনে মনে আগুন হয়ে ওঠে। আচ্ছা এ শম্মাও ছাড়বে না। মেয়ে মানুষের কাছে বিট্ খেয়ে যাবে অমল পাড়ার মেয়েগুলো তো ওকে যমের মত ভয় করে। মৃগনয়নী উনুনের ছাই বেছে বাইরে আসে। ওমা! একি! হাতে কি হোল?

মচকে গেছে। কোনমতে বলেই রাস্তায় বেরিয়ে যায় অমল। পিছনে কাবেরীর খিল খিল হাসিটা কানে বাজে। মৃগনয়নীকে বলছে কাবেরী কি সব ছেলে মাসীমা আপনার! অমল

বাইরে বেরিয়েও ভাবে দেখে নেবে সে। সহজে ছাড়বে না।

সহজে অমল ছাড়েনি। কয়েকটা দিন কাটল। অমল কারো সঙ্গে কথা বলল না। বাড়ীতে এলো সকাল। বাড়ীতেই রইল বেশীর ভাগ সময়। কাবেরী কথা বলতে গেল,— আমাকে খুব সুন্দর দেখতে না অমল? কাবেরী তেমনি মুচ্‌কি হাসে।

—তোমার হাতটা সেরেছে?

—হুঁ। বলে অমল উঠে যায় ওখান থেকে।

কাবেরী তবু ওর পেছনে লাগতে ছাড়ে না। বিছানা করবার সময় অনলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—আমায় অমলের পাশে শুতে দিন মাসীমা। আপনার পাশে আমার গরম লাগে। মৃগনয়নী হাসে। অমল আর কমলের বিছানাই পাশাপাশি করে। অমলের মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। আরও কয়েকটা রাত কাটতে দাও। দেখে নেবে অমল। বহুদিনের কামনা মিটবে এবার। ভোম্‌লা দেখে নেবে অমল। ফতুর করে দিয়ে যাবে।

পরেরদিনও কাটে। তারপর দিন ভোর থেকে অমলকে আর দেখা যায় না। সকালে সবাই যথারীতি উঠে নীচে নামে।

মৃগনয়নী বলতে থাকে,—অমলটা কোথায় গেল। কখন উঠল? সকাল থেকেই দেখছি না। কাবেরী তেমনি দাঁত মাজতে মাজতে বলে,— ও কাঁদন ধরে এমন পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন বলুনত মাসীমা। আমার সামনে ত' আসতেই চায় না। বলে হেসে ওঠে কাবেরী। মৃগনয়নী উত্তর দেয় না। কাজ করতে থাকে নীরবে। কমল উঠেছে অনেকক্ষণ। পড়তে বসেছে। কাবেরী ওপরে যায় কাপড় ছাড়তে। মৃগনয়নী চুপ করে কাজ করে। হঠাৎ ওপরে একটা গোলমাল শুনতে পায়। কমলের উত্তেজিত গলা। কাবেরীর গলাও শোনা যায়। মৃগনয়নী কি একটা আশংকায় চমকে উঠে। ওপরে উঠে যায় তাড়াতাড়ি। কি হোল। ওরা চেঁচাচ্ছে কেন? কমলের গলাটা স্পষ্ট কানে আসে।

এযে ভাবতেও পারিনি। রাস্কেলটা সর্বনাশ করে গেল! মৃগনয়নী ঘরের ভেতরে আসে। কি হয়েছে?

দেখে ভিজে কাপড়েই জানলার তাকের ওপর বসে আছে কাবেরী। হাতে একটুকরো চিঠি। মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে। কমল বলে,—কি আর হবে মা! অমলটা যে এমন সর্বনাশ করবে।

—কি করেছে?

মেজের ওপর কাবেরীর সুটকেশটা খোলা।

সাড়ে পাঁচশ টাকা আর গয়না ছিল দুএকখানা সব নিয়ে পালিয়েছে। একটা চিঠি লিখে গেছে।

[ক্রমশঃ]

আ লো চ না

সাংবাদিকতার বিপদ

সেবার পণ্ডিচেরী থেকে ফিরছিলাম। সবে জহরলাল নেহরু পণ্ডিচেরী পরিদর্শন করে গেছেন। তাঁরই ভ্রমণ সম্পর্কীয় সংবাদ পরিবেশন সেরে সাংবাদিকরাও কেহ কেহ ঘরে ফিরছেন।

শ্রান্ত-ক্লান্ত। পণ্ডিচেরী থেকে মাদ্রাজ মহানগরীর বাস চলাচল পথ খুব খারাপ না হলেও খুব ভালোও বলা চলে না। তায় অপরাহ্নের দক্ষিণী উষ্ণতা দেহকে জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। নেহাৎ সাংবাদিকরা পরাজয় মানতে রাজী নন বলেই ওরাই মধ্যে নানা সমস্যা নিয়ে রীতিমত আলোচনা চালিয়ে চলেছিলেন তাঁরা।

কথায় কথায় একসময় ব্যক্তিগত প্রসংগ উঠে পড়তে একজন প্রবীন ও প্রখ্যাত সাংবাদিক বন্ধু বলছিলেন, "কি কুক্ষণে তাঞ্জোরের গ্রাম থেকে একদিন একটি সংবাদ পাঠিয়ে পারিশ্রমিক হিসাবে সামান্য টাকার একটি চেক্ পাই— সেই চেকই হয় আমার কাল।" সেদিন ওই চেক্ হাতে না এলে অবশ্যই সাংবাদিক বন্ধু সাংবাদিকতার ধারে কাছেও যে আসতেন না, এমন কথা হলপ করে বলে জানালেন, "অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর নয়।"

কথা সেখানেই থামল না। প্রশ্ন উঠল, নিজের ছেলেকে তিনি কি তাঁর পেশায় টানতে বা ঢুকাতে নেহাৎ-ই নারাজ? বন্ধুবর উষ্ণভাবে উত্তর করলেন, "আবার ছেলেরও সাংবাদিকতা! কখনো সে ভুল আর হবে না।"

অর্থাৎ সাংবাদিকতার পেশাতে তিনি আস্থা একেবারেই হারিয়ে বসেছেন। তিনি একাই নন, পুরোনো সাংবাদিকদের অনেকেই এখন বন্ধুবরের মতাবলম্বী। কেবল নতুন কালের নতুন তরুণদের কেহ কেহ অতটা অনাস্থা প্রকাশে সাংবাদিকতার পেশাকে নস্যাৎ করতে এখনো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নয়।

অথচ অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে। অভিজ্ঞতা থেকে শেখবারও আছে অনেক। তাই অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করতে যাওয়া মারাত্মক ভুল। সেই ভুলের পথে পা বাড়িয়ে দেবার আগে প্রবীন প্রখ্যাত সাংবাদিকের চরম অভিমত দৃঢ় হবার কারণ অনুসন্ধান করা কর্তব্য! অনুসন্ধানের অনেক বিপদ। খুঁজতে খুঁজতে এমন বহু কিছু বেরিয়ে পড়তে পারে, যা মোটেই প্রীতিকর নয়। তবুও অনুসন্ধানেই জীবনের প্রধান অভিযান;— জ্ঞানের ও জানার অভিযান এগিয়ে চলে, এ-ও তো সত্য।

ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার ইতিহাস মাত্র দুশত বছরের সীমাও এখনো পেরোয়নি। সাংবাদিকতার পেশার ইতিবৃত্ত তো এইমাত্র বিংশ শতাব্দির ব্যাপার।

ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে ভারতের দিকে দিকে সংবাদপত্র লোকপ্রিয় হতে থাকে। সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা-ও ওই সময় বাড়তির মুখে এগিয়ে চলে। তারপর বিংশ শতাব্দিতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভংগ প্রতিরোধ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন সংবাদপত্র জগতে প্রথম জোয়ার এনে দেয়। ধীরে ধীরে অতঃপর সংবাদপত্র কিছু কিছু লোককে আকর্ষণ করতে লাগে। ওই সময়েও সাংবাদিকতা পেশা হয়ে ওঠেনি। ভারতের মাটিতে প্রথম দিকে সংবাদপত্র

পরিচালকদের অশেষ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বাধা যখন কিছুটা কমতির দিকে তখনও বহু প্রকাশক সর্বস্বান্ত হয়ে গেছলেন সংবাদপত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর কালে, ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী প্রথম অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২৯ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ পর্বের মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রের বিংশ শতাব্দির তৃতীয় দশকে পদার্পণ। প্রকৃতপক্ষে ঐ বিংশ শতাব্দির তৃতীয় দশক থেকেই সাংবাদিকতা নামে মাত্র পেশার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। সে সময়েও ভারতের যে-সকল সাংবাদিক ভারতীয় সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা করতেন তাঁরা পেশার চেয়ে সাংবাদিকতাকে ব্রত হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন বেশি মাত্রায়। অনেকের কাছে ব্রতটা প্রচণ্ড নেশায় রূপান্তরিত হয়েছিল। কাজেই অর্থগত লাভালাভের কোনো প্রশ্নই ছিল না।

তখনকার দিনে দেশের শাসক ছিলেন বিদেশী সরকার। যে কোনো প্রকারে ওই বিদেশী সরকারকে উচ্ছেদ করে স্বদেশী স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার আশা-আকাঙ্খায় দেশবাসীর মনপ্রাণ ভরপুর হয়েছিল সে-সময়। সংবাদপত্রের প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য সেকালে সীমাবদ্ধ ছিল অনেকাংশে দেশের লোকের সেই আশা আকাঙ্খাকে ভাষা দেওয়া এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধতা করায়! সাংবাদিকগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন যে করেছিলেন, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার অবকাশ ছিল না। নানা উত্তেজনায় ও ত্যাগের প্রাবল্যে সাংবাদিকরূপে তখনকার দিনেও আর্থিক দৈন্যকে একরকম ভুলেই ছিলেন আর দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য এমন এক স্তরে চালু ছিল যে, খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন সরল সহজ ত্যাগময় জীবন পরিচালনায় তেমন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু সমস্ত অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেলো পৃথিবীর মহত্তর যুদ্ধের প্রচণ্ড প্লাবনের অসীম ধাক্কায়।

জাপানের বুকে এটম বোমা বিস্ফোরণে নগরী ও নরনারীর-ধ্বংসযজ্ঞে পূর্ণাহুতিতে সভ্যতাদম্ভী মানবগনের মৌলিক সত্তার ও মহান জীবনের মৌলিক মূল্যায়নের মূল উৎপাটন কোরে মহত্তর যুদ্ধবাদীগণ পৃথিবীর বুকে যে অভিনব ও অবিশ্বাস্য নবনীতি ও নবতর রীতির প্রবর্তন করেছিল বিংশ শতাব্দির চতুর্থ দশকে; তারই প্রভাবে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মতই আমাদের দুর্ভাগা ভারতবর্ষের রীতি-নীতি-ঐতিহ্য ইত্যাদি রাতারাতি উল্টাতে লাগল।

মহত্তর যুদ্ধের উত্তর পর্বে দেশ ভাগাভাগির মধ্যদিয়ে ভারতের স্বাধীনতা এলো। সংগে সংগে এলো ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু-বৃদ্ধের তরংগের পর তরংগ। আর প্রতিবাসী রাষ্ট্রের বিরামহীন যুদ্ধ হুঙ্কার তথা প্রত্যক্ষ আক্রমণ রইল উপরি পাওনা। তারই পাশাপাশি নতুন পরিবেশে জীবনের মৌলিক মূল্যায়ন ও গুরুতর ঐতিহ্য ভেসে যেতে লাগল যখন নতুন আবেগের প্রবল উচ্ছাসে, তখন সংবাদপত্র জগতেও আমূল বিপ্লব ঘটে গেছে লোকচক্ষের অন্তরালে। সাংবাদিকতার ব্রত ও নেশা কেটে গেছে চিরদিনের মতন। আদর্শ গেছে পালটে। ব্রত ও নেশার স্থান দখল করেছে নবযুগের প্রেরণা এবং অর্থকরী পেশা।

পৃথিবীর মহত্তর যুদ্ধের উত্তরকাণ্ডে জীবনের সস্তা মূল্যায়নের যুগ আরম্ভ হওয়ায় মানুষের মর্যাদা ও গৌরবাদি নিশ্ধারণের নতুন পদ্ধতি অনুসৃত হতে থাকে। নতুন যুগে বাড়ী-গাড়ী-শাড়ি আর "নিউ-রিচ" সোসাইটির হাল্কা তারিফ মানুষের মনকে প্রভাবান্বিত করতে থাকায় আদর্শবাদী মনেও ভাঙন ধরতে লাগে। অথচ আদর্শচ্যুত হয়ে রাতারাতি "নিউ-রিচ" হবার পথেও অভিযান সকলের পক্ষে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি অনেকের বিবেক ও চিত্তবৃত্তিতে পুরাতন আদর্শ এবং ঐতিহ্য অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁদের পক্ষেও নতুন

যুগের আবহাওয়াকে বরণ কোরে নেওয়া অসম্ভব বল্লে হয়। এমতাবস্থায় ঐতিহ্যবাদী ও আদর্শনিষ্ঠদের জীবনে যে কঠিনতম সংকট দেখা দেয়, সে-সংকটের সমাধান কোথায় বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ?

যাই হোক্, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ভারতীয় সংবাদপত্র সাঁতাকার সুদিনের মুখ দেখতে পায়। সংবাদপত্র পরিচালকগণ দেখতে দেখতে ব্যাপক প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে নিজেদের সুবিধামত সংবাদপত্র সেবাকে ব্যবসাগত বৃত্তিতে রূপান্তরিত কোরবার আগেই সংবাদপত্র ব্যবসায় মুনাফা লোটার দিকে অনেকটা এগিয়ে পড়েন। ফলে সাংবাদিকদের কোনোরূপ সুরাহা হোক্ বা না হোক্, সংবাদপত্র পরিচালক গোষ্ঠীর লাভের অঙ্ক স্ফীত হতে থাকে। যে সংবাদপত্র ছিল অতীতে একদিন দেশ ও সমাজ সেবার তথা বৃটিশ বিরোধিতার প্রধানতম হাতিয়ার ত্রিবং আদর্শবাদের বাহক সেই সংবাদপত্রই একালে অর্থ-অর্জনের অন্যতম "সহায়ক শিল্পে" রূপান্তরিত হওয়ায় নবতম সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বল্লে অত্যুক্তি হয় না।

আধুনিককালে এক একখানি শ্রেণীর সংবাদপত্রের উপার্জন অর্ধকোটি টাকারও উর্ধে। সংবাদপত্র মালিকদের বাড়ী ও গাড়ী তথা সম্পদ সম্পত্তির হিসাবও অন্যান্য শিল্পপতিদের সমতুল্য। একদিকে এই প্রাচুর্য অন্যদিকে সাংবাদিকদের দৈন্যদশা অবিশ্বাস্য হলেও অনস্বীকার্য নয়। কোনো কোনো সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা নামমাত্রমাহিনায় যেখানে সংবাদপত্রকে কেবল বাঁচিয়েই রাখছেন না, এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, সেইক্ষেত্রে মালিকরা সংবাদপত্র শিল্পে অর্জিত অর্থে শুধু যে আমিরী করতেই পটুত্ব প্রদর্শন করছেন তাই নয়, নতুন নতুন ব্যবসা বাণিজ্যে সংবাদপত্রের সম্পদ নিয়োগ কোরে বৃহত্তর মুনাফা শিকারে অগ্রণী হচ্ছেন বলেও শোনা যায়। অথচ সাংবাদিকরা মানুষের মতন বাঁচবার অধিকারের দাবীতে সামান্য বেতন বৃদ্ধি করতে অনুরোধ জানালেই কোনো কোনো সংবাদপত্রের মালিকদের মাথায় বজ্রপাত হয়। তদুপরি প্রায়ই মালিকদের মুখে "সাবধান" লেগেই থাকে, "একালে সাংবাদিকগণ সংবাদপত্রসেবায় আর আগের মতন নিষ্ঠাবান নয়— কেবলই তাঁদের এটা দাও, ওটা বাড়াও, খাই খাই ছাড়া কথা নাই।"

অবশ্য তাই যতটা শোচনীয় ততদূর বিসদৃশ্য। সাঁতাকথা বলতে কি, আজকাল সংবাদপত্র জগতের ভারসাম্য একদমই নেই। দুই একখানি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রসেবীরা যদিও বা বাঁচার মতন বেতন ও মানুষের মতন মর্যাদা পেয়ে আসছেন তবুও বেশির ভাগ সংবাদপত্রের সংগে সংযুক্ত সাংবাদিকগণ বর্তমানে না পান উপযুক্ত বেতন না লাভ করেন মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি সহ মানুষের মর্যাদা। কাজেই প্রবীন প্রথ্যাত সাংবাদিকরা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সাংবাদিকতায় টানতে না চাইলে আশ্চর্য হবার কি থাকতে পারে।

আগের কালে বৃত্তি ছিল বংশানুক্রমিক। ঐতিহাসিক কালের কথাই হচ্ছে। পিতার বৃত্তিতে সহজেই পুত্রের দক্ষতা হওয়া পারিপার্শিক অবস্থার গুণে কিছু অসম্ভব নয়। অন্যথাও হতে পারে। উকিলের পুত্র উকিলই হবে, এমন বেদবাক্য আকড়ে না থাকলেও দেখা যায়, পিতার বৃত্তিতে বেশিরভাগক্ষেত্রে পুত্রের একটা জন্মগত অধিকার ও আকর্ষণ থাকে। দিনরাত্রি এক বিশেষ বৃত্তির চর্চা ও সাধনায় পিতাকে লিপ্ত দেখে পুত্র স্বাভাবিক ভাবেই সেদিকের অনেক-কিছু আয়ত্ত্ব কোরে ফেলে। তাই পুত্র যখন পিতার বৃত্তিতে প্রবেশ করে সে-তখন আর আনাড়ি থাকে না— অনেকটা বোধভাস্য নিয়েই সে উক্ত বৃত্তিতে প্রবেশ-অধিকার পায়। কাজেই বৃত্তির-ক্ষেত্র উর্বরা হয়, বিশুদ্ধ হবার আগেই সেখানে সুজনীহস্তে সঞ্জীবনী সিঞ্চিত হয়ে থাকে। এর ব্যতিক্রম হলে দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও করিৎকুশলতার একদিকে অপবায় আশঙ্কা, অন্যদিকে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। নবাগত, (কেবল নবাগতই নয়, ঐতিহ্যবিহীন-ও বটে) অনুকোরা

নতুন আমদানীর নতুন বৃত্তিতে নতুন কোরে সমস্ত কিছু আয়ত্ব করার প্রয়োজন পড়ে। তাতে সময় নষ্ট হয় এবং অনেকক্ষেত্রে গুণগত বিপর্যয়ও ঘটে। ব্যতিক্রম হয় না কখনো, এমন কথা বলা অযৌক্তিক। কিন্তু ব্যতিক্রম তো নিয়ম নয়। সুতরাং সাংবাদিকগণ, প্রবীণ-প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ-প্রখ্যাত সাংবাদিকগণ তাঁদের পুত্র-কন্যাদের সাংবাদিকতায় টানতে না চাইলে সাংবাদিকতার বৃহৎ কোনো বিপদ না হলেও একটু আধটু বিপদ বৈ কী! বিপদ যখন বিরাট নয়, এবং সাংবাদিকদের পুত্র কন্যারা সাংবাদিকতায় প্রবেশ না করলেও যখন সংবাদপত্র জগৎ বিলুপ্ত হবার কোনোরূপ আশঙ্কা অদূর ভবিষ্যতে নাই— তখন প্রবীণ সাংবাদিক বন্ধুরা পুত্রকে সাংবাদিকতার বৃত্তিতে না টানতেই যদি বন্ধুবরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাতে আশঙ্কাজনক ভাবনার এমন কি আছে আর!

সুতরাং সাংবাদিকতার আসল ও সাঁত্যকার বিপদ এখানে অন্যত্র অনুসন্ধান না কোরলে সঠিক সন্ধান পাওয়া যাবে না। সে অনুসন্ধান কার্য সমস্যাসঙ্কুল তো বটেই, তাতে বিপদের আশঙ্কাও বড় কম নয়! সাংবাদিকতা যতদিন ব্রত ও নেশা ছিল, ততদিন সাংবাদিক যাঁরা হতেন, সংবাদপত্র প্রকাশে যাঁরা অর্থ নিয়োগ করতেন তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন আদর্শবাদী। অর্থের জোয়ার অপেক্ষা আদর্শরক্ষার তাড়নায় অদ্ভূত এক স্রোতাবর্তের মুখে ছুটে চলায় তাদের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাই আদর্শ যেখানে ব্যাহত হবার, ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকতো— সেখানে তাঁরা নির্মম নিষ্ঠায় আত্মরক্ষার্থে তৎপর হতেন। কোনোক্রমেই আদর্শভ্রষ্ট হতে তাঁদের দেখা যেত না। অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির প্রলোভনে তাঁদের প্রলুব্ধ করাও ছিল একরকম অসম্ভব। কারাবরণে, দারিদ্র গ্রহণে, দুঃখ দুর্দশাকে সানন্দে মেনে নিতে তাঁদের আনন্দ ছিল। তাই সহজে কোথাও তাঁরা মাথা নোয়াতেন না।

সাংবাদিকতার পেশার যুগে এমন অনেকে সংবাদপত্র পরিচালনায় হাত দিয়েছেন যাঁরা সাংবাদিকতার ধার ধারেন না, (অতীতে কিন্তু বহু পরিচালকই স্বয়ং বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিলেন) সাংবাদিকতার খোঁজ খবরও রাখতে তেমন চান না; তবে বিশেষ আগ্রহে ও তৎপরতার সংগে সংবাদপত্র থেকে সম্পদলাভ করতে চান সর্বদাই। এই নতুন পরিচালকদের স্বার্থ আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী। এবং যেহেতু তাঁরা পরিচালক সেতেু তাঁদের সর্বগ্রাসীস্বার্থগুলির যথাযোগ্য প্রচার ও বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় জায়গা না পেলেই নয়। মালিকের ইচ্ছাই যেখানে আইন সেখানে পেশাদার সাংবাদিকদের অবস্থাও অনুমেয়!..... কাজেই অবস্থাটা বুঝে উঠতে কারো কষ্ট হবার নয়।

মালিকের ব্যক্তিগত বিচিত্র ও সর্বগ্রাসী স্বার্থছাড়াও সংবাদপত্রকে একালে ব্যাপক বিজ্ঞানের উপরে নির্ভর করতে হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনদাতারা অতীতে বিজ্ঞাপনে তেমন বিরাট অর্থ এদেশে অনন্ত ব্যয় করতেন না। বর্তমানে দেশের শিল্পোন্নতির সংগে সংগে এমন বিজ্ঞাপনদাতাও আছেন যাঁর বিজ্ঞাপনের বাজেট লক্ষ লক্ষ টাকার। প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র উক্ত বাজেটের অংশ পেয়ে থাকেন। প্রথম প্রথম বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন দিয়েই যেতেন; বিজ্ঞাপনের মূল্য শোধ করতেও তাঁরা আসলের উপরি ফাও দাবী করতেন না। কালক্রমে সে অবস্থা পালটে গেলো। পালটালো খুব স্বল্পকালের মধ্যেই এবং অতি সম্প্রতি। আজকাল বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন দেবার সৌভাগ্যবশে সংবাদপত্রে তাঁদের নিজস্ব সংবাদ প্রকাশের সুযোগ সুবিধা দাবী করে থাকেন কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও বা অপ্রকাশ্যে। পেশাদার সাংবাদিকরা আগের কাল হলে এমতাবস্থায় কি করতেন কে জানে; কিন্তু একালে মালিকের স্বার্থে এবং নিজের স্বার্থেও বটে; বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনী সংবাদ-ও একটু "নলচে আড়াল" দিয়ে তাঁরা হামেশাই রচনা কোরে থাকেন। তদুপরি আজকাল ঘনঘন শিল্পের উদ্বোধন, শিল্পক্ষেত্রে মন্ত্রীদের বা সরকারী বড় কর্তাদের

আগমন ইত্যাদি লেগেই আছে। সেই সংগে শিল্পপতিদের খুশি রাখতে ছবি ছাপানো থেকে বিশেষ প্রবন্ধ ফাঁদা পর্যন্ত সমস্তই সাংবাদিকদের দায়িত্বের সীমায় এসে হাজির হয়েছে।

এর উপরি ঘনঘন প্রেস-কনফারেন্স যেন একটা সার্বক্ষিক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে এদেশে। কারণে অকারণে মন্ত্রীদের সাপ্তাহিক, মাসিক, কখনো কখনো এমন কি দৈনিক প্রেস কনফারেন্স হবেই। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রিয় মন্ত্রীদের প্রেস কনফারেন্সে অনেক সময় এমন কোনো জ্ঞাতব্য বা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা কিংবা সমস্যা আলোচনা হয় না—যা হুবহু সংবাদপত্রের পাতায় স্থানও পাবার যোগ্যতা দাবী করতে পারে। কিন্তু সংবাদপত্রের অন্যতম প্রধান বিজ্ঞাপনদাতা হিসাবে কেন্দ্রিয় সরকার ও প্রান্তীয় রাজ্যসরকারের যেন একটি অলিখিত ও অদৃশ্য অধিকার জন্মে গেছে সংবাদপত্রে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে বসবার অথচ সরকারের যথার্থ সমালোচনার জন্য সংবাদপত্রে একালে জায়গা মেলা ভার।

বৃটিশ শাসনের আমলে সাংবাদিকদের মধ্যে দলীয় রাজনীতির ক্ষতিকর প্রভাব তেমন মারাত্মক হয়ে ওঠেনি কোনোদিন। বৃটিশ শাসনের শেষদিকে অবশ্যি একটু একটু দলীয় রাজনীতির প্রভাব সংবাদপত্রগুলিকে স্পর্শ করতে থাকে। আর স্বদেশী শাসনের এ-আমলে এদেশে বহু রাজনৈতিক দল নানাভাবে নানা মনে প্রভাব বিস্তার করতে উদ্‌গ্রীব। দলীয় সংবাদপত্রও আজকাল দুর্লভ নয়। কিন্তু জাতীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের তাতে বিপদ বেড়েছে বৈ কমেনি। সরকারী মন্ত্রীদের প্রেস-কনফারেন্স-এ উপস্থিতির চেয়েও কোনো কোনো সময় দলীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রেস-কনফারেন্স তথা সভাসমিতিতে সাংবাদিকদের উপস্থিতি কেবল যে অবশ্যম্ভাবী তাই নয়, অনেক সময় ওই সকল সমাবেশে সাংবাদিকদের আবার শাসানো পর্যন্ত হয়। শাসানো না হয় গণ্ডারের চামড়ায় অসহ্য নয়, কিন্তু ঐখানেই তো সাংবাদিকতার বিপদ একালে শেষ হয়ে যায়নি।

গণতন্ত্রের যুগে সংবাদপত্র যেমন অর্থকরী শিল্প হিসাবে পুষ্ট হতে চলেছে তেমনি লক্ষ লক্ষ পাঠকের রুচি ও অভিরুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে এ-যুগে নতুন এক ধরণের সাংবাদিকতার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠকের রুচি-অভিরুচি বলে যে সকল বস্তু আমদানী করা হচ্ছে, সেগুলি মালিকপক্ষের কল্পকল্পিত বলেও সন্দেহ করেন কেহ কেহ। তথাপি এই নতুন ধরণের সাংবাদিকতায় যাঁরা সাংবাদিক হিসাবে নাম লিখিয়েছেন, তাঁদের বিপদ প্রণিধান-যোগ্য। পেটের দায়ে পেশা হিসাবে সাংবাদিকতা গ্রহণ কোরে লক্ষ লক্ষ লোকের আশা আকাঙ্খাকে ভাষা দেওয়া আপাতত স্থগিত রেখে সিনেমা তারকাদের জীবনী, উন্মাসিকদের চিত্তবিকার রোমন্থন ও তথাকথিত একালের অত্যাধুনিক এ্যারিষ্টক্রেসীর অতি গোপনীয় ব্যক্তিগত সংবাদ এবং খুনখারাপি, জালিয়াতি জোচ্চুরির পঞ্চমুখীর বর্ণনায় যেখানে সাংবাদিকতাকে সীমিত করতে হয়, সেক্ষেত্রে সাংবাদিকতার চরমদশাকে অস্বীকার করবেন এমন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কে আছেন? সুতরাং অধিকদূর অগ্রসর হবার আর প্রয়োজন কোথায়! অবস্থা এমন শোচনীয় যে কেবল আর্থিক দিক দিয়েই নয়, সাংবাদিকতার বিপদ বর্তমানে সরকারী-বেসরকারী তথা নৈতিক দিক দিয়েও চরম সংকটময়।

অমল ঘোষ

ছেলে চাই

ছেলে চাই, দই চাই নিয়ে গান লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ছেলে চাই নিয়ে গল্প—তাঁর প্রায় প্রথম গল্প দেনা পাওনা। আমাদের অনাদিকালের অতি সনাতন হিন্দু সমাজ, যার মহাভারতে বৈরাগ্য, উপনিষদে অমৃতবার্তা, গীতায় কর্মভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় সেই হিন্দুসমাজের সদর দরজায় বসে সমাজপতিদের এবং তাদের দেখাদেখি আর সকলের ছেলে বেচা ব্যবসা বহুকাল ধরে চলছে। যারা গোঁড়া হিন্দু, যারা মন্তর না পড়ে জল খায় না, যারা ত্রিসন্ধ্যা জপ করে, ঘরে যাদের অবতার অবতারিণীদের, ঠাকুর-ঠাকরুণদের ছবি তারাও যেমন, কোর্টপ্যান্ট পরে যারা আধুনিক, কেলনারের চা খেয়ে যারা সাযেব, আসেম্বলীতে বক্তৃতা ঝেড়ে যারা পোলিটিশ্যান তারাও তেমনি— ঐখানে তাদের ইউনাইটেড ফ্রন্ট—ছেলে বেচার টাকায় তাঁরা ছেলের বিয়েতে ধুমধাম করে, বাজনা বাজায়, ঝাড় লণ্ঠন দোলায় বাজারে নাম কেনে। এই বাজারের বাবুরা হিন্দুই হোন অ-হিন্দুই হোন, টিকিধারী হোন বা টাইধারী হোন ছেলের বৌ আর টাকার থলে দুই তাঁরা সমান জ্ঞান করেন।

কিন্তু শুধু ছেলের বাবাদের গাল পেড়ে লাভ কি? ছেলেও হিন্দুসমাজে যা জন্মাচ্ছে সব ধনুর্ধর। লম্বা চওড়া বুলি ছাড়ছে, আদর্শের জন্যে প্রাণটা যখন তখন দিয়ে দেয় আর কি, স্বাধীন মতামতের তারা ঘোর পক্ষপাতী কেবল বিয়ের সময় একটু পিতৃমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। তখন আদর্শগুলো কিছুকালের জন্য চাপা থাকে, টাঁকের পয়সা খরচ না করে শ্বশুরের হাত তোলা পয়সায় বন্ধুদের ভূরিভোজ করিয়ে আমাদের খোকাবাবুরা ফূর্তিতে মশগুল।

এই নির্লজ্জ ব্যবসায় দরাদরির অবকাশ অল্প নয়। মেয়ে কালো অতএব—মেয়ে বেশী লেখাপড়া জানেনা তাই—মেয়ে একটু বেশী রোগা সুতরাং—সুতরাং টাকা বাজাও—মেয়েও বাজবে। ছেলের বাপের এবং ছেলের ভোঁতা মুখের মধ্যে থেকে বত্রিশপাটি দাঁতের ফোসা হাসি ঠিকরে বেরুবে। দুই বেয়াই গলাগলি করবে। মেয়েপক্ষ একটু অ্যারিস্টোক্রেট হলে মনে মনে গাল পাড়বে। কিন্তু তবু টাকা গুণে দেবে কারণ এটাই রেওয়াজ—আর ঐতেই থাকে প্রেস্টিজ।

অর্থগৃধ্নুতা সংসারের সব ব্যবসায়ীর মধ্যেই আছে—তারই বীভৎসতম, জঘন্যতম রূপ ছেলের ব্যবসায়। কাল যে আত্মীয় হবে, ঘরের কল্যাণ যার উপর নির্ভর করবে, সন্তানের যে হবে জননী পুরো টাকা বিবাহসভায় না মিটলে তাকে প্রত্যাখ্যান করার ইতিহাস এদেশে অল্প নয়। উপরকার মেকী পালিশ যখন খসে পড়ে তখন ভিতরকার লোভী শকুনিটা বিবাহবাসরের আলোকসজ্জা ম্লান করে, সানাইয়ের সুর বেসুরো করে ডানা ঝটপট করে হিসাব মেটানোর দাবী করে। হিসাব মিটলেই আবার দে'তো আর ছে'দো কথায় আসর জমে উঠবে।

পৌরুষের অহংকার পুরুষমাত্রেরই কিছু না কিছু থাকে না থাকাটাই অস্বাভাবিক। কিন্তু মেয়ের বাপের কাছ থেকে বিয়ের খরচটা তুলে নেবার চেষ্টা হয় যখন তখন সেই পৌরুষের দম্ভ কোথায় থাকে। ছেলের আয় যত বেশী, বাপের জমানো টাকা যত বেশী, মেয়ের বাপের উপরও জুলুম তত বেশী। যার ছেলে যত বেশী পায় সে তত অ্যারিস্টোক্রেট।

বিয়ের বাজারের এই ফাটকাবাজী ক্রমশঃ বাড়ছে—ছড়িয়ে যাচ্ছে সমাজের সর্বস্তরে। উচ্চশিক্ষার জৌলুষ, বনেদীঘরের দম্ভ, আদর্শবাদের অহংকার সব ফুঁসে গিয়ে ঐ ফাটকাবাজীর চেহারাটাই ফুটে বেরুচ্ছে। এরই নাম অগ্রগতি। বাইরের সাজ যতই বদলাক ভেতরটা সেই আগের মতোই লোভী আছে। যে লোভে লোকে চোরাকারবারী হয়, যে লোভে ঘিঁয়ে চর্বি মিশিয়ে মোটা লাভ করে আর সেই লাভের কিয়দংশে গো-মাতা রক্ষা আন্দোলন করে সেই লোভ আর ছেলের বিয়েতে পয়সা পেটার লোভে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। বিলিতি আদব কায়দা আর যেখানে যতটাই গ্রহণ করিনা কেন, এখানটায় আমরা দেশাচার আর সমাজের চলতি রীতিকে একশোবার মানি। তখন রুশো ভলটেয়ার মিল মার্ক্স ছিটকে যায়— একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে ওঠে কসাইপনার দেশাচার।

দেশে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন যখন চলছে তখন পণপ্রথা পুরোদমে শিকড় গেড়ে বসছে—এটা যেমন স্ববিরোধী তেমনি হাস্যকর। যে মেয়ে লেখাপড়া শিখলো, একা একা চলতে শিখলো, কাজকর্মও করতে লাগলো, তার বিয়েতেও কি নিস্তার আছে। পয়সা গোণার হিসেব একটুও বদলালো না। অথচ সেই মেয়ে তো স্বাধীন জেনানা। নারী স্বাধীনতার আন্দোলনের থারা পুরোভাগে তাঁরা অনেক রকম দাবী তোলেন কিন্তু পণ দেবোনা একথা বলতে ভরসা পাননা। কারণ পণের পাসপোর্ট না হলে কনে পার করা যায় না।

অতএব এই কি চলবে। বাইরে ভদ্রতা ভিতরে পাটোয়ারী ফড়েগিরি;—এ চলতে বাধা যতদিন না আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হচ্ছে। এমন ভাবে আত্মসম্মানবোধ আমাদের লুপ্ত হয়েছে যে এই দেনাপাওনার মধ্যে কোথাও যে অর্শোভনতা আছে তা মনেই হয় না। হিসেব-নিকেশের কলুষ না মাখিয়ে আমরা কোন বিয়েই হতে দিই না। যেখানে বিয়ের মধ্যে পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক আকর্ষণের কোন যোগ নাই সেখানে পাত্রীপক্ষের সামাজিক মর্যাদা, কুলগৌরব আর ঘুষের অঙ্কটাই প্রথম বিচার্য বস্তু হয়ে পড়ে। তারপর এক শুভরাতে এই অশুভ দেনাপাওনার খেলা চলে শাড়ী আর গয়নার আবরণের অন্তরালে—পরিণাম যে সর্বদা শুভ নয় একথা বাংলা-দেশের লোককে নতুন করে বোঝানোর দরকার নেই।

নারীস্বাধীনতার লড়াইয়ের মধ্যেই পণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই চলাতে হবে। এ দেশের ছেলেদের বিবাহকালীন পিতৃভক্তি অকস্মাৎ কমে যাবে এমন ভরসা নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কলম ধরলেন, আহা মরি হলো অনেক কিন্তু কবির কথায় হিসেবী লোকেদের হিসেব থামেনি। মেয়েরা যদি নিজেরা বেঁকে বসার শক্তি অর্জন না করে তবে জাগ্রত পৌরুষ পুরুষ নিজেকে বেচতে চাইবে না, দোকানের শো কেসে সাজানো পুতুলের মতো গায়ে টাকার অংক বেঁধে বেড়াবে না এ ভরসা কম। ব্যতিক্রম আছে অনেক, তাতে সাধারণ নীতির সত্যতা আরও বেশী প্রমাণিত হচ্ছে।

সোমেন বসু

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

পেশাদার মঞ্চে প্রগতিশীল নাটক

নবনাট্য আন্দোলনের শুরু বিখ্যাত নাটক "নবান্ন"-এর জনপ্রিয়তা থেকে। তথাকথিত এ্যামেচার জাতে উঠল তখন থেকে। নাটক, অভিনয় এবং মঞ্চ পরিকল্পনার অভিনব প্রয়োগ পশ্চাতির সমাক পরিচয় পেয়ে শিশিরযুগের স্রষ্টা শিশিরকুমার অভিনন্দন জানালেন নবনাট্য আন্দোলনকে অন্যান্য নাট্যানুরাগীদের সঙ্গে। তারপর এই নবনাট্য আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সত্যিকারের এ্যামেচার সুলভ মনোবৃত্তির প্রভাব আজও কাটিয়ে ওঠা যায়নি বটে, তবু ক্রমে ক্রমে নতুন নাট্যসংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজের বাস্তবতাকে প্রকাশ করে নতুনতর আঙ্গিকে প্রয়োগের প্রচেষ্টা চলেছে— এটা কম কথা নয়। শ্রীতরুণ রায় নবনাট্য আন্দোলনের একজন নাট্যরথী। তিনি বিদেশ থেকে নাট্যচর্চা সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কলকাতায় "থিয়েটার সেন্টার" গড়ে তুলে নবনাট্য আন্দোলনের কাজকে সমৃদ্ধ করার ব্রত নিয়েছেন। কিছুদিন আগে নাট্যজগতে সংবাদ প্রকাশিত হল যে, তিনি "রঙমহল" পেশাদার মঞ্চের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। এই শুভ সংবাদ নাট্যানুরাগীদের কাছে আনন্দের কথা বলেই বিবেচিত হয়েছে। কেননা, পেশাদার মঞ্চে ক্ষয়িষ্ণুতার কথা স্মরণ করে ইদানিং আশা করার মত কোন প্রডাকশন্ দেখা যাচ্ছিল না বিশেষ ভাবে। "রঙমহল" মঞ্চে তরুণ বাবুর প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগীর নতুন নাটক "এক মুঠো আকাশ" নিয়ে। নাটকটি নাট্যকারের ঐ একই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ।

নাটকের প্রথম দৃশ্য আরম্ভ হয়েছে অনন্ত কেবিন নামে এক রেস্ট্রেন্ট থেকে। বহু মানুষ জটলা করছে কেবিনের সম্মুখে। শ্যামল নামে এক স্কুল পালানো ছেলে সিগারেট টানছিল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আপত্তি করাতে গোলমাল হতে থাকে। নাটকের নায়ক কেষ্ট তার বাড়ী থেকে নেমে আসে। প্রৌঢ় ভদ্রলোককে ধমক দিয়ে হটিয়ে শ্যামলকে কাছে টেনে নেয় কেষ্ট। শ্যামল স্কুলে যায় না, কিন্তু স্কুলের বেতন অপব্যয় করে। কেষ্টর সঙ্গে শ্যামলের রফা হয়, শ্যামলের শিক্ষার ব্যয় ধনীদের কাছে চেয়ে নেওয়া হবে তার অংশে ভাগ নেবে কেষ্ট আর শ্যামল অর্ধেক করে। পাড়ার বিশেষ ধনী রঘু ব্যানার্জীর সখ হয়েছে বিধান সভার সদস্য হওয়ার। তিনি এলেন অনন্ত কেবিনে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইতে। কেষ্ট আর তার দলের ছেলেরা ওঁকে জিতিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। রঘুবাবু নিজের জয়ের আশায় টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন ওদের। টালীগঞ্জের উদ্বাস্তু মেয়ে গৌরী এল কেষ্টর কাছে অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশায়। তার ভাই-এর বড় অসুখ। কেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়ে বলে, অসুখের সত্য-অসত্য যাচাই করা দরকার। সত্য প্রমাণ হলে সাহায্য দেওয়া যাবে। গৌরীর ভাই মরণাপন্ন। যক্ষ্মারোগে ভুগছে ও। টাকা দিয়েও বাঁচান যায় না গৌরীর ভাইকে। বস্তির লোকজন সন্দেহ করে কেষ্ট আর গৌরীর সম্পর্কে। তাই ওরা দুজন চলে এল বেহালায়।

কেষ্ট ওর নিজের বাড়ীতে দাদাদের সঙ্গে থাকে। দাদা, বৌদি, আর ভাইঝি শ্যামকে নিয়ে সংসার। দাদার সঙ্গে বিবাদে কেষ্টর মনে শান্তি নেই। তাই রাত্রে বাড়ী থাকলেও কেষ্টর নতুন জীবন শুরু হয় বেহালার বাড়ীতে যেখানে গৌরীকে ও এনেছে। গৌরীর পাশের ঘরে

বিনু নামে একটি মেয়ে থাকে। পিনাকী নামে এক ফটোগ্রাফারের সঙ্গে ও ঘরছাড়া। ওদের বিয়ে হয়নি। চিনু বিয়ে করে সংসার পাততে চায়। বিয়েতে পিনাকীর আপত্তি থাকার জন্যে চিনুকে সিঁদুরের পরে আঁশ মেটাতে হয়েছে। ও টাকা রোজগার করে অভিনেত্রী হয়ে। কেষ্ট উপদেশ দেয় গৌরীকে। টাকা উপার্জন করতে হবে মিথ্যা কথা বলে। কারণ, পৃথিবীটা মিথ্যা দিয়ে ভরা। তাই মিথ্যা কথা বলে জীবন ধারণের চেষ্টা করা দোষের নয় কেষ্টর মতে। গৌরীর বিবেক সায় দেয় না এই কাজ করতে। গৌরী স্থির করে ও টাকা আনবে অভিনেত্রী হয়ে। চিনুর সঙ্গে ও চলে আসে অভিনেত্রী হওয়ার জন্যে। কেষ্ট সম্মতি দেয় তাতে। ইতিমধ্যে, রঘুবাবুর বিধান সভার সদস্য হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মাঝখান থেকে কেষ্ট, ওর দলের ছেলেরা এবং অনন্ত কোবিনের মালিক আঁশুদা বেশ মোটা পয়সা কামিয়ে নেয়।

কেষ্টর ভাইঝি শ্যামাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে কেষ্ট নিজে। শ্যামা কেষ্টর স্নেহের বন্ধনে বাঁধা। ওর বাবা যখন এক দোজবরের সঙ্গে ওর বিয়ে দেন, তখন ওকে চলে যেতে হয় বরের বাড়ী কিশোরপুরে। কেষ্টর এবিয়েতে আপত্তি ছিল। পরে কিশোরপুরে শ্যামার কাছে এসে কেষ্ট নবজন্মলাভ করে। এখানে শ্যামার বর ব্রজদুলালবাবুর সঙ্গে ওর বেশ ভাব হয়ে যায়। ব্রজদুলালবাবু তাঁর জীবনদর্শনে দীক্ষা দেন কেষ্টকে। জীবনের আসল সত্যকে খুঁজে পাবার প্রেরণা পায় কেষ্ট। কেষ্ট বোঝে তার দলের প্রিয়তম শ্যামল কালী গুণ্ডার সাকরেদ হয়েছে। চুরি ইত্যাদি অপরাধে শ্যামলের পাকা হাত। কেষ্ট ওর আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দেয় শ্যামলকে। এদিকে গৌরী পাকা অভিনেত্রী হয়ে বিনোদবাবু নামে এক ধনী ব্যক্তির আশ্রয়ে চলে যায়। কেষ্টর বন্ধু প্রভাতের নাটকে মহলা দেবার মধ্যে দিয়ে বিনোদবাবুর সঙ্গে গৌরীর পরিচয়। কেষ্ট বুঝতে পারে যে, তার মিথ্যা দর্শনে দীক্ষা নিয়ে শ্যামল আর গৌরী বিপথে পা দিয়েছে। দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় বিহ্বল হ'ল কেষ্ট। চিনু সান্ত্বনা দেয় কেষ্টকে। কেষ্ট চিনুর মধ্যে প্রেম খুঁজে পায়। চিনু আর কেষ্ট আশা করে সংসার পাতার। তা বুঝি সফল হয় না। পুলিশের হাত থেকে শ্যামলকে রেহাই দিতে গিয়ে নিজেই চোর বদনাম গ্রহণ করে কেষ্ট। পুলিশের সঙ্গে থানায় যাওয়ার আগে কেষ্ট চিনুকে বলে যায় যে, গৌরী যেন সুখী হয় বিনোদবাবুকে গ্রহণ করে।

উপন্যাসের মধ্যে বর্ত্তমান মধ্যবিত্ত সমাজের ঘুণধরা রূপটি এক বিরাট ক্যানভাসের পটভূমিকায় বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নাটারূপের মধ্যে এত সংখ্যক চরিত্র আনা সম্ভব নয়। তাই কিছু রদবদল করে সম্পাদনার সাহায্যে নাটারূপ দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের মূল বাস্তবতার রূপ প্রতিটি দৃশ্যে দেখান হয়েছে। কলকাতার প্রত্যেক পাড়ার অলিতে-গলিতে কেষ্ট, তার দলের বাজে ছেলেরা, আশুদা, রঘু ব্যানার্জ্জী, কালীগুণ্ডা, ধনী বিনোদবাবু, উদ্বাস্তু মেয়ে গৌরী আর চিনু প্রভৃতিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলেই আমরা এদের চিনি। মানুষ অবিমিশ্র ভাল হয় না প্রায়ই। দোষ-গুণ মিলিয়ে মানুষের পরিচয়। তার মহত্ত্ব অথবা হীন মনোবৃত্তি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রকাশ করে সামাজিক হয়ে। ক্রমে ক্রমে সাধারণ মানুষ সমাজ ব্যবস্থার দোষে পশু হয়ে পড়ছে এটা যেমন সত্য; ঠিক তেমন সত্য সেই সাধারণ মানুষ আত্মবিশ্বাসে বল খুঁজে পেয়ে বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে তাকে অগ্রাহ্য করে তার নিজের মহিমায় গড়ে তুলছে সমাজ-সংসার। মূল উপন্যাসে দুটি চিত্র তুলে ধরা আছে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকে মানুষের হীন মনোবৃত্তির পরিচয় স্পষ্টভাবে হলেও মানুষের মহত্ত্বের অন্য পরিচয়টুকু আরও স্পষ্টভাবে দেখান হয়নি। উপন্যাসের অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র প্রভাতকে দেখান হয়েছে যে, সে বেলাবাণীর কু-প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়ে, সিনেমার চটুলতায়

নিজেকে বিসর্জ্জন না দিয়ে, প্রকৃতভাবে বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে অরুণাকে ভালবেসে। অরুণার মা-বাবাকে নতুন আশা দিয়ে সংসার গড়ে তুলেছে। সমাজের সুস্থ চিত্র ফুটে উঠেছে প্রভাতের নতুন সংসারে। তাকে নাটকে স্থান দেওয়া হয়নি। বরং মূল কাহিনীর সঙ্গে যাদের বিশেষ যোগসত্র নেই সেই মন্দা এবং তার প্রেমিকা নন্দিতাকে অনাবশ্যকভাবে নাটকে এনে গতিকে কিছুটা শ্লথ করে দিতে সাহায্য করেছে। কেষ্টর মিথ্যাদর্শন ব্যর্থ হয়ে যায় সত্য কথা, কিন্তু তারই পাশে প্রভাত, ব্রজরাখালবাবু এবং চিনু যে সুস্থ জীবনদর্শনকে রূপ দিয়েছে উপন্যাসে, তা অনিবার্য্যভাবে আনা উচিত ছিল নাটকের শেষের দিকে। নাটকে দেখাগেল যে, ব্রজরাখালবাবুর বক্তব্যকে ঠিকভাবে দর্শকের সম্মুখে এনে না দিয়ে পট পরিবর্ত্তন করিয়ে দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। নাটকের প্রোগ্রামের মধ্যে উল্লিখিত শেষ অঙ্ক অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে ব্রজরাখালবাবুকে দর্শকের সম্মুখে আর আনা হয়নি। ঘটনার ক্রম পরিণতি দেখাতে গিয়ে প্রথমে ও দ্বিতীয় অঙ্কের গতির তুলনায় বেশ কিছুটা গতি শ্লথ হয়েছে শেষ অঙ্কে। অথচ উপন্যাসে দেখতে পাই শেষ অংশ প্রথম অংশের চেয়ে অনেক বেশী গতিসম্পন্ন। নাটকের শেষ অঙ্কে উপন্যাসের হুবহু শেষ অংশ নাটারূপ দিলে হয়ত আরও জমে যেত নাটক। নাটকে সমাজের অন্যায়ের প্রতি একটা তীব্র প্রতিবাদ আছে। তবু সমাজের গতি রুদ্ধ হচ্ছে যে বিকৃতির জন্যে তা থেকে সমাজকে বাঁচাবার জন্যে নাটকে যে স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রয়োজন ছিল তা একরকম অনুপস্থিত বলা যায়। উপন্যাসের ভাল-মন্দের দুটি চিত্র ঠিকভাবে নাটকে আনলে নাটকের বক্তব্য আরও সজোরে প্রকাশ পেতে পারত।

নাটাকারের অন্য নাটকে "রূপোলী চাঁদ"-এ দেখা যায় নাটকের এক বিশিষ্ট চরিত্র চোরের বদনাম গ্রহণ করে নিজের মহত্ত্বের যে ভাবে পরিচয় দিয়েছে, ঠিক সেইরকম এই নাটকের নায়ক কেষ্টকেও দেখা গেল চোরের বদনাম নিজের গায়ে মেখে নিতে। এই একই ফরমুলার প্রয়োগে পরিণতি ঘটাবার চেষ্টাকে বড় দৃষ্টিকটু লাগে। উপন্যাসের নামকরণ শেষ পৃষ্ঠায় বিবৃত হয়েছে কেষ্ট আর চিনুর মিলনের মধ্যে দিয়ে। সামান্য কিছু অংশ তুলে দেওয়া যাক্ উপন্যাস থেকে। "...কেষ্ট থামিয়ে দেয়। বলে, থাক্ ওসব পুরাণো কথা। আজ আমি অনেকদিন বাদে অগের মতো হৈ-হৈ করতে পেরেছি! মনের মধ্যে আর কোন মযলা নেই, পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি কি ভাবছিলাম জানো?—কি?—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। একটু চুপ করে থেকে বলে, আগে ভাবতাম, বিয়ের অনুষ্ঠান বড় করে না হলে মনে তৃপ্তি পাবো না। কিন্তু আজ বুঝেছি সে সব মিথ্যে। মনের মধ্যে তোমাকে আমি পেয়েছি। চিনু কোন উত্তর দিতে পারে না। কেষ্টর কাঁধের ওপর আলতো হাত রাখে। কেষ্ট চিনুকে কাছে টেনে নেয়। জানলা দিয়ে দূরে তাকিয়ে দেখে, ফ্রেম-বাঁধা একটুকরো আকাশ। নির্মল পবিত্র এক মুঠো আকাশ। দু'জনে সেইদিকে চেয়ে থাকে।" এখানে ওদের দু'জনের ভবিষ্যতের গর্ভে যে আশা আছে তাকে এইভাবে দেখান হয়েছে। যেন আশার প্রতীক আকাশ। উপন্যাসের এই সুন্দর আশার চিত্র নাটকের ক্ষেত্রে নামের মধ্যে সার্থক হয়ে ওঠেনি। আর কত সংখ্যক দর্শক এই নামকরণ বুঝবে?

উপন্যাসের নাটারূপের ব্যাপারে ত্রুটি থাকলেও নাটকের অভিনয়ের অংশ বড় চমৎকার হয়েছে। বিশেষ করে এত ভাল টিম ওয়ার্ক পেশাদার মঞ্চে দেখাই যায় না। কেষ্টর দলের ছেলেদের চীৎকার-হল্লা, পাঁশাপাশি ছোট কাটা কাটা সংলাপ, রঘু ব্যানার্জ্জীকে নিয়ে হৈ-চৈ, এই সমস্ত অংশগুলি 'গ্রুপ এক্যুটিং'-এর মধ্যে অপূর্ব্বভাবে জমেছে। অভিনয় শিল্পীদের

নিজস্ব ক্ষমতার গুণে নাটকের প্রথম অংশ তীব্র গতি পায়। তবু কয়েকজনের নামের উল্লেখের প্রয়োজন আছে। কেষ্টর ভূমিকায় পরিচালক শ্রীতরুণ রায় চরিত্রের নিজস্ব তীক্ষ্ণতা সজোরে প্রকাশ করেছেন নিজেকে চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়ে। বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা শ্রীজহর রায় রঘু ব্যানার্জীর চরিত্রে ক্ষমতার প্রতি লোভ, পরাজয়ের পর অসহায় অবস্থা, এই সমস্ত চরিত্র চিত্রণ তাঁর অভিনয়ে স্মরণযোগ্য করে তুলেছেন, যা দর্শকদের কৌতুকে অভিভূত করে দেয়। ব্রজদুলালবাবুর ছোট চরিত্রে একটি মাত্র দৃশ্যের সুযোগে শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিভার স্পর্শ রেখে যান। প্রায় সকল অভিনয়-শিল্পীরা পুরুষচরিত্রগুলিতে চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন। স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে গৌরীর ভূমিকায় শ্রীদীপান্বিতা রায় চরিত্রের প্রথম সলজ্জভাব তারপর পাকা অভিনেত্রী হওয়ার ক্রম পরিণতি সঠিকভাবে রূপ দিয়েছেন। চিনুর ভূমিকায় শ্রীকেতকী দত্তের মিষ্টি অভিনয় চরিত্রের সংযমকে ফুটিয়ে তুলেছে। শ্যামা, নন্দিতা, বেলারাণী এবং বাড়ীওয়ালার ছোট চরিত্রগুলি যথাক্রমে শ্রীকবিতা রায়, শ্রীশুক্লা দাস, শ্রী শীলা পাল এবং শ্রীআশা দেবী চলনসৈ অভিনয় করেছেন। সু-গায়ক শ্রীরবীন মজুমদারের গাওয়া গান দুটি সুগীত হয়েছে। শ্যামলের ভূমিকায় শ্রীপিকলু নিয়োগীর লজেন্স বিক্রেতারূপে বিকৃত অঙ্গ-ভঙ্গী সহযোগে নাচ-গান চরিত্রোপযোগী হয়েছে। নাটকে আবহ-সঙ্গীতের প্রয়োজন আছে। অথচ পরিচালক তা' বাদ দেওয়াতে ঐতিহ্য-বিরোধী কাজ করা হয়েছে অযথা।

পরিশেষে, একটা কথা বলার আছে। প্রগতিশীল নাটকের প্রোডাক্শন-এ দোষ-ত্রুটি একটু বেশী থাকে। ওটা নতুন চেষ্টা বলে সকলেই মেনে নেয়। সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পেশাদার মঞ্চের সাময়িকতাত্ত্বিক আবহাওয়াকে মুক্ত করার কাজে সাফল্যলাভ করা। সে কাজ করতে পারলে মঞ্চের বর্ত্তমান ক্ষয়িষ্ণুতা দূর হয়ে প্রগতিশীল নাট্যরথীদের যাত্রা সুগম হবে পেশাদার মঞ্চে। "রঙমহল"-এর পরিচালক শ্রীতরুণ রায়ের কাছে এই আশাই ব্যক্ত করার আছে।

অমিতাভ মৈত্র

স মা লো চ না

পার্ক ॥ সরিৎশেখর মজুমদার। প্রাচী পাব্‌লিকেশনস্‌, ২/২ সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলিকাতা-২৯। মূল্য চারটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সম্প্রতি কোনো এক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এক সংখ্যানে দেখিয়েছেন বাংলা গল্প উপন্যাসের চল প্রায় শতকরা পঁচাত্তর। উপন্যাসেরও বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু যাঁরা খোঁজ রাখেন, তাঁরা জানেন নিম্নতর প্রবৃত্তির উত্তেজক বই আমাদের দেশে এখন যত চলছে অন্য শ্রেণীর বই তত নয়। কথাটা দুঃখের কিন্তু মিথ্যা নয় এমন কি নিরুৎসাহ হবার মতোও নয়। সব সময়ে সব দেশেই এরকম ঘটনা অবিরল। আমাদের দেশে রচনাকর্ম সর্বসাধ্য হয়েছে। সব কিছুই গল্প উপন্যাসের রঙে রঞ্জিত না করলে পাঠকের চোখ তাতে পড়ে না। কোনো একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে শুনলেই প্রথমেই মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু এ যুগেরও তো ভাষা চাই উপন্যাসের প্রয়োজন তো ক্রমেই বেড়ে চলেছে, এ কথা অস্বীকার করি কি করে?

অনেক ঐশ্বর্যপূর্ণ কলরবমুখর সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক যুগের মতো বঙ্কিমের যুগও বিগত। সেযুগে উপন্যাস ছিল মিশ্র রীতির—নাটক এবং উপন্যাসের মিশ্রণ। বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলেছিলেন যদি লিখে কিছু উপকার করতে পারবেন বলে মনে করেন, তবেই লিখবেন। এই কথাটার একটা প্রশস্ত অর্থ ধরাই সঙ্গত। শুধু উপস্থিত প্রয়োজন নয় কিংবা শিল্পের অখণ্ড রূপকল্পনায়। উপাদান উপকরণ সংগ্রহ সমন্বয়ের নৈপুণ্যের উপর সেটা নির্ভর করে। উপাদান আর উপকরণই সহজ-আলোচ্য বিষয়। রসের কথাটা গৌণ কারণ রসসৃষ্টি করব বল্লেই রসের সৃষ্টি হয় না। কোনো প্রখ্যাত সমালোচক বলেছিলেন, বাঙালী জীবনের বৈচিত্রহীন মন্থর নিস্তরঙ্গতা লিরিক-ধর্মী গল্পসৃষ্টির যতখানি অনুকূল অন্যবিধ গল্প উপন্যাসের পক্ষে তত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রস ঠিক লিরিকের নয়, সি ছিল নাটকের। উপন্যাসের ত্বরিত ঘটনা আনতে হয়েছে ইতিহাস থেকে। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কথাসাহিত্যের মোড় ফিরে গেল— নাটকীয়তার জায়গায় লিরিসিজম এল।

দীর্ঘকাল এই প্রকৃতি চলে এসেছে। এর মধ্যে নানা ভঙ্গি নানা লেখকের হাতে ফুটে উঠল। বাঙালী জীবনের মধ্যে এল প্রচণ্ড পরিবর্তন— সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা আন্দোলন উদ্বাস্তু সমস্যা। এই সমস্যাগুলি জাতীয় জীবনের অচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যও নয়, স্বভাবও নয়। এই সংঘাত নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা সাধু কিন্তু উদ্যম শক্তিশালী হবে তখনই যখন জীবনের গভীরতর চেতনা এই সাময়িক বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শ্রীযুক্ত সরিৎশেখর মজুমদারের পার্ক উপন্যাসটি পড়ে এ রকম কতকগুলি চিন্তা মনে এল। উপন্যাসের বিষয় স্বাধীনতার ঠিক পূর্ববর্তী দেশের কয়েকটি অনিশ্চিত অবস্থা। বইখানা বড়ো নয় কিন্তু এই অল্প পরিসরে কাহিনীর স্থানগত পটভূমি খুবই ব্যাপক— ময়মনসিংহের এক অজ্ঞাত চরবাঘবেড়ে গ্রাম, কলিকাতা এবং আসামের কোনো শহর। গল্প কখনো কখনো গোয়েন্দাকাহিনীর মতো মনে হয়। পার্কে পাওয়া একটা কাটা হাত দিয়ে গল্পের আরম্ভ। উপন্যাসে কোনো নায়ক নেই, যাকে গল্পের ঠিক মধ্যবর্তী চরিত্র বলা যেতে পারে। নায়িকা আছে

একজন কোন দূর গ্রামের এক দুর্ভাগা মেয়ে ঘটনার সংঘাতে যাকে কলকাতায় এসে প্রাণ হারাতে হয়েছে। গল্পের শেষে যখন অপঘাত-মৃত্যুর কারণ জানলাম তখন মনে একটা নৈরাশ্য অনুভব করেছি, এ কথা অস্বীকার করব না। যে কারণটা আকস্মিক তার জন্য এই প্রসারিত পটভূমি এতো চরিত্র এতো ঔৎসুক্য সৃষ্টি করবার সত্যিই কি দরকার ছিল? কাহিনী যখন গুটিয়ে আনা হচ্ছে, তখন কয়েকটি দৈব বা accident-এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে। সব সময় সেটা স্বাভাবিক মনে হয় নি।

লেখকের দিকটাও ভেবে দেখবার আছে। সে দিক দিয়ে দেখলে উপন্যাসের বিচিত্র শিল্প রীতির অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের জীবন মেশানো ভালোয় মন্দয়। শান্তির দিনে যেমন অমানুষের সাক্ষাৎ খুবই সম্ভব অশান্তির দিনেও তেমনি মানুষের সাক্ষাৎ খুবই সম্ভব। শুধু দুর্দিনের মন্থনে নিক্ষিপ্ত ক্লেদ নিরীহ মানুষকেও কালিমালিপ্ত করে— মনে হয় সেটাই বুঝি প্রকৃতির নিয়ম। যাঁরা একেই একমাত্র সত্য মনে করেন তাঁরা একদেশদর্শী। সত্যিকারের শিল্পী একটা ক্রুর শক্তির উপস্থিতিকে অনুভব করতে পারলেও সৎ এবং অসৎ সমন্বিত চিরকালের মানবচেতনাকে অন্তর প্রদীপরূপেই জ্বালিয়ে তোলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অশুভ ছায়ায় সমস্ত দেশেই আলোড়ন এল। সেই আলোড়ন দেশের কোন দুর্গম অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করল, সুযোগসন্ধানী মানুষকে কত হিংস্র ও কুটিল করে তুলল, মানুষকে করল গৃহহারা কেন্দ্রচ্যুত এবং হৃদয়হীন। এই অনিশ্চিত সময়ের ঘটনাকাল অনেকটাই দৈবনিয়ন্ত্রিত। লেখক দৈবের প্রভাবকে মেনে নিলেও এই অস্বাভাবিক সময়ে একেবারে অসঙ্গত সেটা ছিল না। বস্তুত উপন্যাস যে নায়কহীন, তার খুব উপযুক্ত কারণ আছে। উপন্যাসে ব্যক্তিগুলি খানিকটা অবস্থার দ্বারা চালিত হচ্ছে। অবস্থা এবং পরিবেশ রচনাই এই উপন্যাসে প্রধান। সেইজন্য কাহিনীর জল জটিল। আর এই জন্যই চরিত্রগুলি টাইপধর্মা। লেখকের উদ্দেশ্য পাঠকের মনে effect সৃষ্টি করা, চরিত্র ফোটানো নয়, কাহিনীর নাটকীয় সংহতি আনাও নয়। এই মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম অস্বাভাবিক সময়ে পূর্ণ মানবচরিত্র কিংবা পূর্ণ জীবনরেখা পাওয়া যাবে না।

একটি পার্কের সাজান্যে বাগানের ফুল ফল গাছ পাখীর মৌন ভাষণ দিয়ে লেখক গল্প বলতে আরম্ভ করেছেন। এই সহজ আনন্দ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের আভাস নিয়ে এসেছে আর তার পাশেই মানুষের ক্ষণিক মূঢ়তা এবং অসংযত বিকৃতি। সংঘাত আর গান—এই নিয়েই তো জীবনের সমগ্রতা।

ভবতোষ দত্ত

ব্যঞ্জনা ও কাব্য (তৃতীয় খণ্ড) : হরিহর মিশ্র। পরিবেশক : গ্রন্থজগৎ, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাত-১২। মূল্য : আড়াই টাকা।

বাংলা দেশে আজকাল ব্যক্তিগত ভাল-লাগা এবং মন্দ-লাগা সাহিত্য সমালোচনা নামে চলে যাচ্ছে যে সমালোচকের মনোভাব পিউরিটান তিনি সাহিত্যে নরনারীর জৈবিক সম্পর্কের চিত্রণে বাড়াবাড়ি দেখলেই 'গেল গেল' রব তোলেন, আবার যিনি পাণ্ডিত্যের নমুনায়েশে আত্মতৃপ্তি বোধ করেন, তিনি বিদেশী সাহিত্যের দোহাই দিয়ে বলেন, 'খিস্তি' কেন আমাদের সাহিত্যের ভাষা হবে না। বলা বাহুল্য উভয় শ্রেণীর সমালোচকই ভ্রান্তিবিলাসে মগ্ন। এবং এই ভ্রান্তির কারণ আর কিছুই

নয়, কতকগুলো প্রাক-সিদ্ধান্ত এঁরা মনে মনে লালন করেন।

যথার্থভাবে সাহিত্যবিচার করতে গেলে স্বীয় বোধ ও রুচির সযত্ন অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। এর জন্যে আলঙ্কারিকদের স্বারস্থ হতে হবে। ভারতীয় ও ইউরোপীয় আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যবিচারের যে পথনির্দেশ করে গেছেন, তা পাঠে আমরা রসশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারি। এবং এই জ্ঞান অধিগত করে দীর্ঘকাল ক্লাসিক সাহিত্যের চর্চায় নিমগ্ন থাকলে তবেই প্রকৃত রসবোধ জন্মায়, গোড়ামী দূর হয়।

শ্রীহরিহর মিশ্রের 'ব্যঞ্জনা ও কাব্য' গ্রন্থটি এদিক থেকে আমাদের যথেষ্ট উপকার দর্শাবে, কারণ এতে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। লেখক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করে, তার সঙ্গে বাংলা অর্থ দিয়েছেন এবং সেটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

বর্তমান গ্রন্থটি তৃতীয় খণ্ড। ইতিপূর্বে 'ব্যঞ্জনা ও কাব্যে'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এ-দুটি খণ্ডে যথাক্রমে 'শব্দ ও তাহার শক্তি' এবং 'বস্তু-ধ্বনি ও অলঙ্কার ধ্বনি' বিষয়ে লেখক আলোচনা করেছেন।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে রসধ্বনির স্বরূপবিচার আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রসের বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক এখানে উদাহরণ সহযোগে সমস্ত মতগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। এবং বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর আলোচনা থেকে রসের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ধ্বনিবাদের বিরোধী মত ও তার খণ্ডন। ধ্বনিবাদ প্রচারিত হওয়ার পর বিভিন্ন সমালোচক এর বিরোধী মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে, ধ্বনিবাদীরা যার নাম দিয়েছেন ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি, ব্যঞ্জনাশক্তি স্বীকার না করেও তা অন্য উপায়ে লাভ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন এবং ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধে বারটি মতের সাক্ষাৎ মেলে। আলোচ্য গ্রন্থে মহিমভট্টের অনুমিতিবাদ সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে এবং তাঁর মত ধ্বনিবাদীরা কি ভাবে খণ্ডন করেছেন তারও আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

পরিশেষে, এই ধরণের একখানি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশককে সাধুবাদ জানাই।

বিশ্বভারতী পত্রিকা : কার্তিক- পৌষ, ১৮৮০ শকাব্দ ॥ সম্পাদক : পুলিনবিহারী সেন ॥ ৬।১ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন থেকে প্রকাশিত । মূল্য : তিন টাকা।

বিদগ্ধ পাঠক মহলে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র বিশেষ একটি স্থান আছে। এর প্রতি সংখ্যায় যে ধরণের মননশীল ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়, বাংলা দেশের খুব কম পত্রিকায় তার তুল্য রচনা চোখে পড়ে।

'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র কার্তিক-পৌষ সংখ্যাটি একটি বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। জগদীশচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র ও কার্বের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁদের মনীষী-জীবন ও কর্মসাধনা সম্পর্কে বাংলা দেশের চিন্তাশীলরা আলোচনা করেছেন।

জগদীশচন্দ্র পর্যায়ের রচনাগুলিতে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিচরিত্র ও কর্মসাধনার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। ব্যক্তিমানুষ জগদীশচন্দ্রের আলোচনা করেছেন রথীন্দ্র-

নাথ ঠাকুর; তাঁর আলোচনায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি ও বৈজ্ঞানিকের মৌল ঐক্যের কথা বলেছেন। দেবেন্দ্রমোহন বসু বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ রচনায় পুলিনবিহারী সেন বিশ্ববিখ্যাত কবি ও বিজ্ঞানীর সৌহার্দ্যের বিষয় আলোচনা করেছেন। এই পর্যায়ে নন্দলাল বসু ও ক্ষিতিমোহন সেনের দুটি রচনাও স্থান পেয়েছে।

বিপিনচন্দ্র পর্যায়ে ভবতোষ দত্ত, নির্মলকুমার বসু ও বিনয় ঘোষের তিনটি মূল্যবান আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। ভবতোষ দত্ত বিপিনচন্দ্রের সাহিত্যিক সত্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং নির্মলকুমার বসু তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করেছেন। বিনয় ঘোষ বিপিনচন্দ্রের সাত খানি ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর রচনায়।

ভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সমাজসেবী শতবর্ষজীবী আচার্য কার্বের জীবনাদর্শ সম্পর্কে লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায় এবং জীবনকথা আলোচনা করেছেন সুশীল রায়।

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি ছাড়া জগদীশচন্দ্র অবলা বসু ও বিপিনচন্দ্রের কয়েকটি প্রবন্ধ, অবলা বসু, জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ, বিপিনচন্দ্রের পত্রগুচ্ছ, বিপিনচন্দ্রের দুটি স্বদেশী গান ও কটি ব্রহ্মসঙ্গীত এবং জগদীশচন্দ্রের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে রচিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মনীষী-মঙ্গল' কবিতাটি পুনর্মুদ্রণ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র বর্তমান সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিও এতে রয়েছে এবং আলোকচিত্রও।

হীরেন বসু